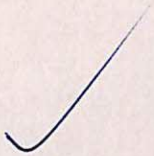
সাগরতলের রূপকথা

নারায়ণচন্দ্র চন্দ



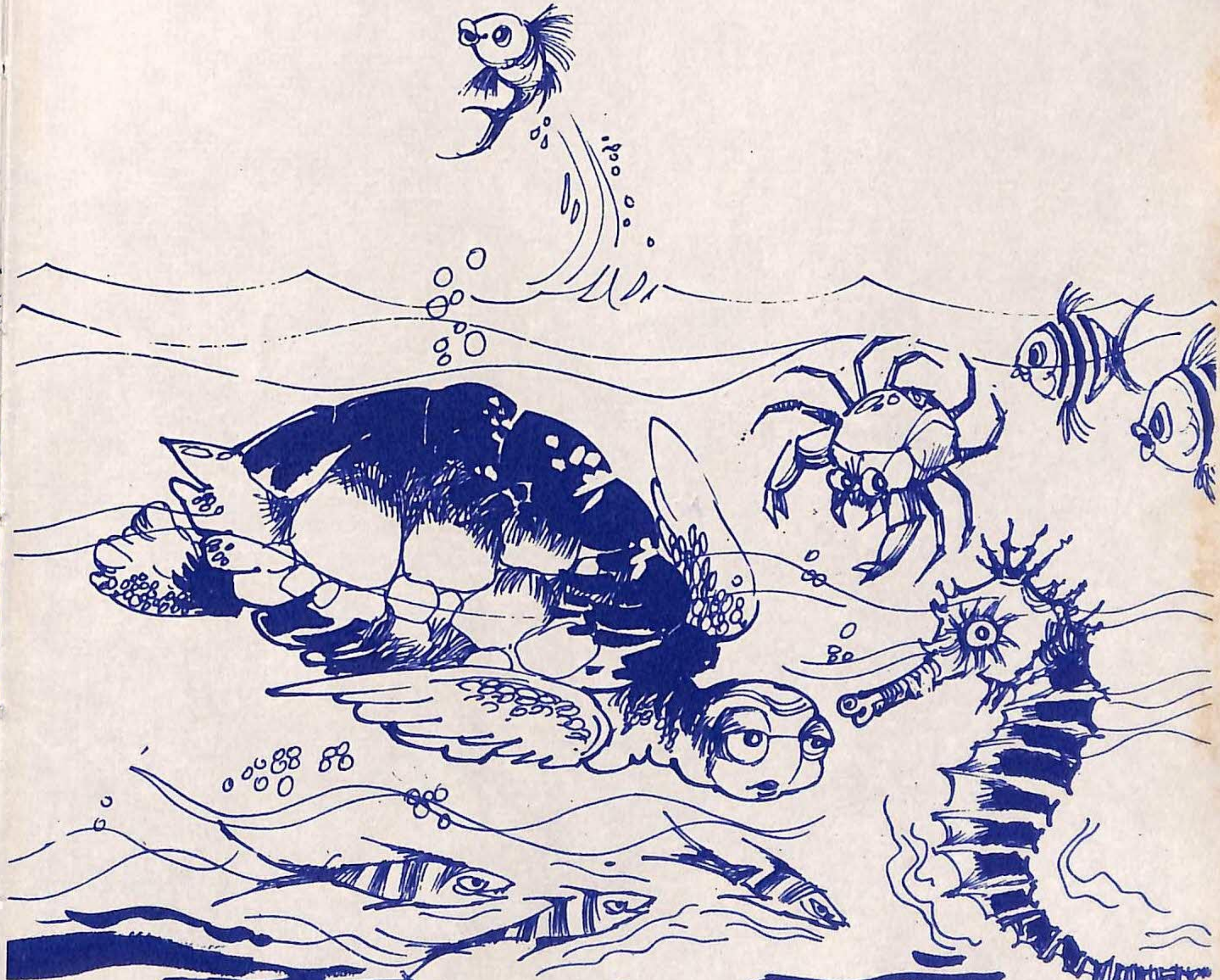


সাগরতলের রূপকথা



সাগরতলের রূপকথা

নারায়ণচন্দ্র চন্দ



লেখনী প্রকাশন
কলকাতা

SAGORTALER ROOPKATHA

The lore of life under the sea

Narayan Chandra Chanda

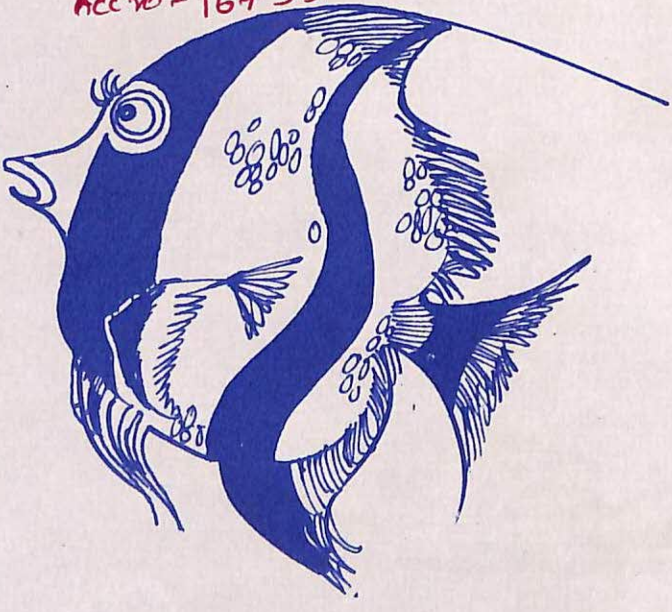
প্রথম পরিমার্জিত **'লেখনী'** সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৯৯

প্রথম মুদ্রণ: ডলফিনের সঙ্গে সাগরে, ১৩৯৩

প্রকাশক :
সংঘমিত্রা চন্দ
১২/১ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ফটোটাইপ সেটিং :
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩



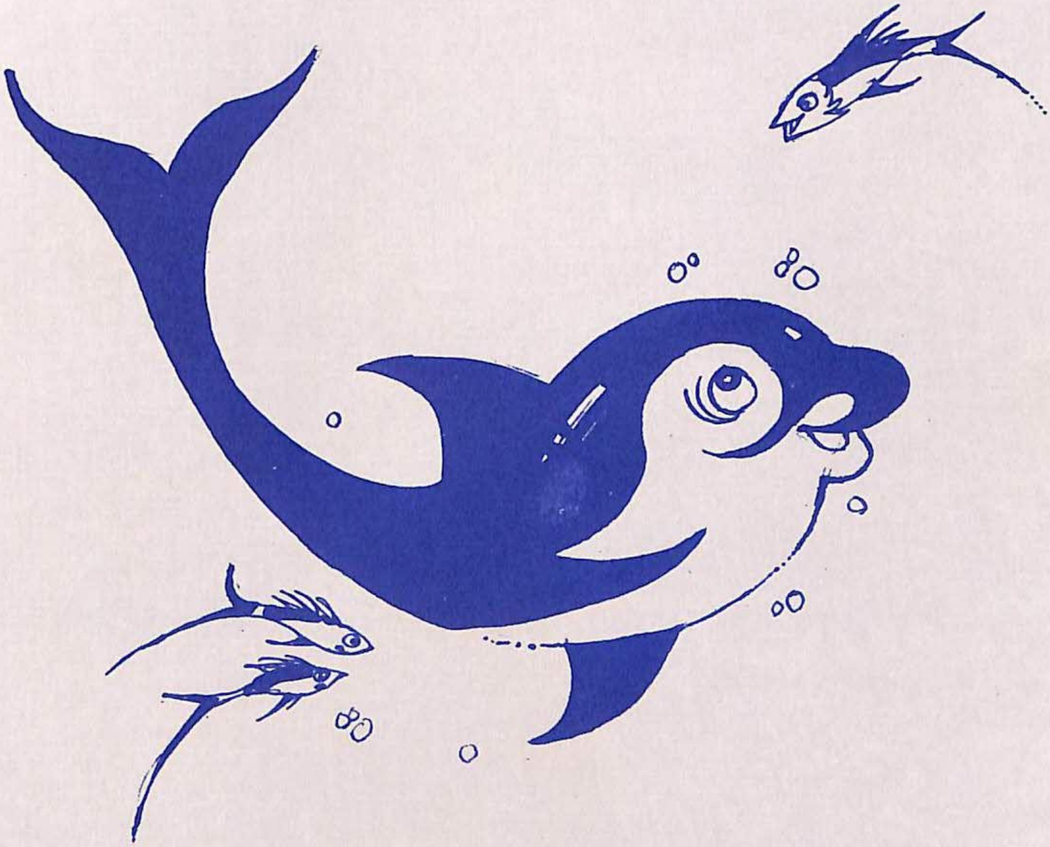


মুদ্রাকর :
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সর্বজিৎ সেন

পরিবেশক :
জে. এন. চক্রবর্তী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মূল্য: ত্রিশ টাকা মাত্র



সাগর উদ্যান



নীল সাগরের মধ্যে নীল পাহাড়ের এক দ্বীপ। মোচার মাথার মত। ওপরে সরু গোল চুড়ো, নীচের দিক ঢালু হয়ে সাগরজলে নেমেছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ বন, তাতে রাশি রাশি ফল, ডালে ডালে নানা জাতের পাখি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে, পাহাড়ের গা ঘিরে, বড় বড় বাড়ি ধাপে ধাপে চুড়োর দিকে উঠে গেছে। বাড়িগুলি নানা রঙের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে। সাগরের কিনারায় সেগুলি, তাদের রঙিন ছায়া নীল স্বচ্ছ জলের ওপর পড়ে দিনরাত ঢেউ-এর দোলায় নাচে।

উড়োজাহাজ থেকে দিনের বেলায় দ্বীপটিকে দেখায় বড় একখানা নোঙ্গরফেলা জাহাজের মত। রাত্রিতে আলোকমালায় সাজানো দ্বীপ দেখে মনে হয় দীপালির সন্ধ্যায় কে যেন এক বিরাট স্থির আলোর প্রদীপ সাগরজলে ভাসিয়ে রেখেছে, তাতে লাল নীল হলুদ সবুজ আলোর ঝিলিমিলি।

বড় দ্বীপের পশ্চিম দিকে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ। সেখানে বাড়িঘর কম, সাগরের কিনারা দিয়ে বেড়ানোর পথ। বড় দ্বীপ থেকে লোকেরা ছোট ছোট লন্‌চে, নৌকোয় এখানে স্নান করতে আসে, মাঝে মাঝে বনভোজন করে। এরই একটি দ্বীপে গড়ে উঠেছে নতুন সাগর-উদ্যান। সেখানে সাগরের কিছু অংশ ঘিরে নিয়ে রাখা হয়েছে নানা সামুদ্রিক প্রাণী। এটি সাগরজলে চিড়িয়াখানা। মানুষের আদর যত্নে অনেক প্রাণীই পোষ মেনেছে, মানুষের সঙ্গে তাদের বেশ মিতালি। রোপ-ওয়ে দিয়ে ঝোলানো তারের পালকির আসনে বসে সাগর-উদ্যান ঘুরে দেখার সুযোগ। তখন দেখা যাবে, কিছু ছেলেমেয়ে কচ্ছপ ও ডলফিনের পিঠে দাঁড়িয়ে জল-দৌড়ের পাল্লা দিচ্ছে। ডাঙার প্রাণী আর জলের প্রাণীর প্রীতি উৎসব যেন!

অমিত একদিন তার মায়ের সঙ্গে সাগর উদ্যান দেখতে গেছে। শূন্যে ঝোলানো তারের গাড়ির মধ্যে আরাম করে বসে চারিদিক সুন্দর দেখা যায়। জলের সামান্য ওপর দিয়ে খাঁচা-গাড়ি ধীরে ধীরে চলে, নীচে সাগর-প্রাণীদের খেলা, তাদের সঙ্গে কিশোর কিশোরীদের মেলামেশা একই দলের খেলোয়াড়দের মত। এসব দেখে অমিত অবাক! ভাবে, সেও ওই রকম সাগরের ডলফিন আর কচ্ছপের সঙ্গে খেলা করবে। অমিত মা-বাবার সঙ্গে হংকং-এ থাকে। ভারতে থাকতে সে এমন সাগর-ঘেরা জায়গা দেখেনি। সাংবাদিক বাবার সঙ্গে সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে গিয়েছে। এরোপ্লেনে যাবার সময় সাগর দেখেছে, যবদ্বীপ, বালী, সুমাত্রায় সাগরতীর দেখেছে কিন্তু সাগরজলে এমন মাছে-মানুষে খেলা দেখেনি।

সাগর উদ্যানে পৌঁছে অমিত এক নতুন জগতের সন্ধান পেল। মস্তবড় কাঁচের ঘরে কত রঙিন মাছ, নীল জলে যেন সব রঙিন প্রজাপতি! জলের ভিতরে সবুজ গাছপালার মধ্য দিয়ে রঙিন মৌটুসি পাখির মত তারা কেমন অনায়াসে ঘুরে বেড়ায়।

হঠাৎ অমিতের চোখ পড়ল মাঠের দিকে। দেখল, একটি মেয়ে প্রকাণ্ড এক কচ্ছপের পিঠে বসে আছে আর কচ্ছপটা হাতির বাচ্চার মত চার পায়ে হেঁটে তাকে নিয়ে ঘুরছে। ব্যাপার কী তা দেখার জন্য সে দৌড়ে গেল।

প্রথমে ভয় ভয় করে, কামড়াবে না তো? মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, ও কি পোষা? কামড়ায় না?

—না, না। মিস্টার ওল্ড টরটয়েজ ভারি শান্ত। কিছু বলে না। আমি কতদিন ওর পিঠে উঠেছি। তুমি চড়বে?

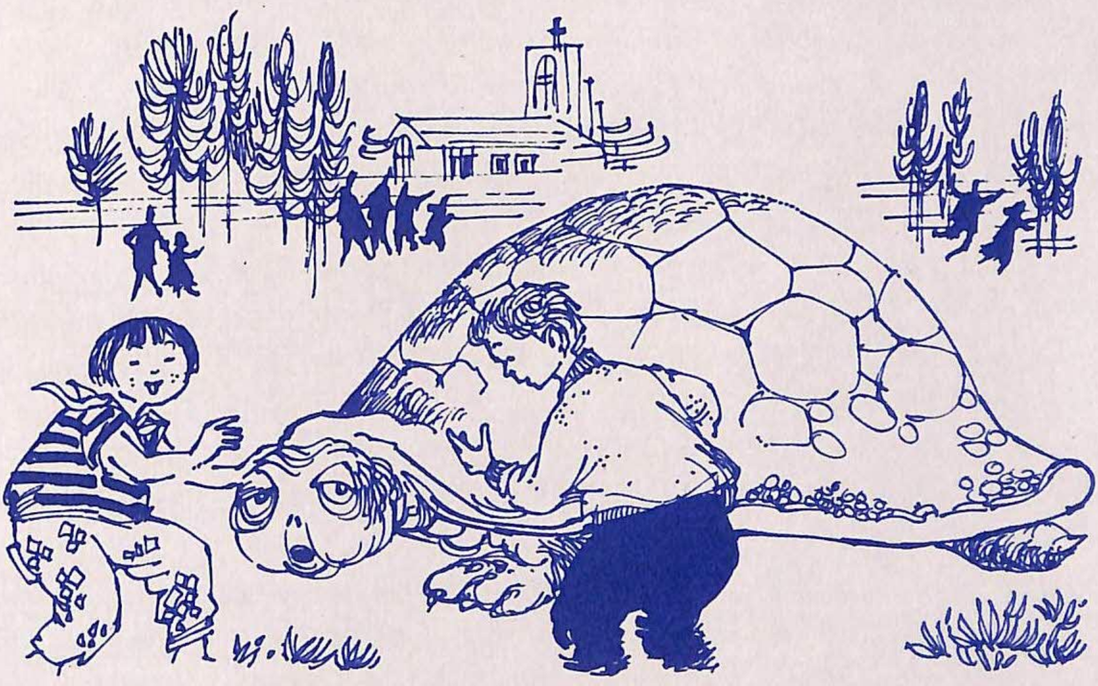
—হ্যাঁ, কিন্তু যদি পড়ে যাই?

—পড়বে কেন? ঘোড়ার মত এতে ঝাঁকুনি নেই, নৌকোর মত দুলুনি নেই, ঠিক যেন স্কুটার—বলেই মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে লাগল।

অমিত বলে—তুমি কিন্তু আমার কাছে কাছে থেকো। ওকে থামাও, আমি চড়ে দেখি।

পিং কচ্ছপের পিঠ থেকে নেমে, পিঠে হাত দিয়ে আদর করতে করতে বলল—থামো, ওল্ড বয়।

কী আশ্চর্য! কচ্ছপ মানুষের কথা বোঝে! সে চুপ করে দাঁড়াল। পাঁচফুট লম্বা, তিন ফুট উঁচু। পিঠের খোলায় জ্যামিতির নকশার মত চৌকো দাগ। এক সময়ে দাগগুলো হলুদরঙের ছিল, এখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মোটা মোটা পা কালচে আঁশ দিয়ে জড়ানো, নখগুলো অনেকটা ক্ষয়ে গেছে।



পিং-এর হাত ধরে অমিত কচ্ছপের পিঠে উঠে বসল। পিং বলল—চলো ওল্ড বয়। কচ্ছপ হাঁটতে লাগল, পিং হাততালি দিতে দিতে পাশে পাশে হেঁটে চলল।

পিং-এর হাততালির শব্দ শুনে অমিতের মা বাগানের মধ্যে ওদের দেখতে পেয়েছেন। অমিত কচ্ছপের পিঠে চড়েছে দেখে কাছে এসে হাসতে হাসতে বললেন—সাবাস অমিত! এ যে মহারাজার পোষা হাতি! একাই উঠতে পেরেছ?

—ওল্ডবয় খুব শান্ত মা, তবে পিং সাহায্য করেছে।

পিং বলে—অমিতেরও বেশ সাহস, আন্টি। মোটেই ভয় পায়নি।

কিছুক্ষণ কচ্ছপের পিঠে বেড়িয়ে অমিত নামল। মা বললেন—এতক্ষণ ওল্ডবয় তোমাদের পিঠে নিয়ে বেড়ালো। এখন ওকে কিছু খেতে দেবে না?

অমিত জিজ্ঞেস করে—ও কী খায়? কেক, বিস্কুট কিংবা কফি খাবে?

মা বললেন—না। দাঁড়াও।

তারপর খাবারের ঝুড়ির ভিতর থেকে লম্বালম্বি চার ফালি করে কাটা কয়েকটা শশা তিনি বের করলেন। পিং ও অমিতের হাতে দু'টি করে শশা দিয়ে বললেন—যাও, তোমাদের বন্ধুকে খেতে দাও, ধন্যবাদ জানাও। দেখো, মুখে যেন হাত ঢুকে না যায়।

পিং আর অমিত শশা নিয়ে দৌড়িয়ে গেল কচ্ছপের দিকে। সে তখন মাঠ থেকে ঘাস তুলে খাওয়ার চেষ্টা করছিল। পিং বলল—ওল্ডবয় এসো। এই তোমার টিফিন।

এক একটি ফালি-শশা কচ্ছপের সামনে ধরতেই সে মস্তবড় হাঁ করে তা মুখে নিয়ে চটপট গিলে ফেলতে লাগল। অমিত দেখে, কচ্ছপের খাঁজকাটা চোয়াল বেশ শক্ত। তাই দিয়ে বুড়ো মানুষের মত খাবার না চিবিয়ে প্রায় আস্তই গিলে ফেলছে। পিং-এর শশা ফুরিয়ে গেলে অমিত ভয়ে ভয়ে নিজের শশার ফালিটা তার মুখের সামনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সে গলা এগিয়ে দিয়ে খাবার নিয়ে খুশিমনে চিবোতে থাকে। কচ্ছপের চোখের দিকে তাকিয়ে অমিত দেখে তাতে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই, বরং মনে হয় কত অজানা বিস্ময় যেন ওর জানা। বড় বড় চোখ, ফ্যাকাশে ধোঁয়ার মত রঙ, তার মধ্যে কালো টলটলে চোখের মণি। বহুকালের পুরাণো সব ঘটনা, যা সে নিজে দেখেছে, তা হয়ত ওই ঘোলাটে পরদার নীচে জড়ো করে রাখা। আর ক্যামেরার লেনস-এর মত চোখের মণি দিয়ে সে মানুষের মনের ভিতরটা মনে হয় স্পষ্ট দেখতে পায়।

অমিত অনেকক্ষণ কচ্ছপের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। যাবার সময় বলে—ধন্যবাদ, ওল্ডবয়, আবার আসব। কচ্ছপ ওর দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয় যেন কিছু বলতে চায়।

খানিক দূরে গিয়ে অমিত আবার ফিরে আসে, বলে—আচ্ছা ওল্ডবয়, ঈশপের গল্পে যে-কচ্ছপ আর খরগোশের দৌড়পাল্লার কথা আছে, তুমি কি সেই দৌড়জেতা বীর?

ওল্ডবয় যেন অমিতের কথাটা বুঝল। ঘাস তুলে চিবোচ্ছিল সে। খাবারটা গিলে ফেলতে মাথা ঝাঁকাল। অমিত ভাবল, ওল্ডবয় খুশি হয়েছে, কিন্তু নিজের গৌরবের কথা মুখ ফুটে বলছে না, শুধু মাথা দুলিয়ে তা জানিয়ে দিল। গুণী জন কখনও নিজের কীর্তি নিজে প্রচার করতে চান না।

বুড়োকত্তা



সন্ধ্যায় অমিতের বাবা বাড়ি ফিরতেই অমিত ছুটে গিয়ে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরল। বলে—আজ কী কাণ্ড জান বাবা! ওল্ডবয়ের পিঠে চড়ে রেস দিলাম।

—ওল্ডবয় কে? কোন বাড়ির ছেলে?

—চিনলে না? সেই যে খরগোশের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় যে জিতেছিল, যে-কচ্ছপের কথা ঈশপের গল্পের বইতে আছে!

বাবা তো হেসেই অস্থির। বলেন—তাহলে তুমি এক কাজ করো। ওল্ডবয়কে ভারতের দৌড়বীরদের প্রতিনিধি করে অলিম্পিকে পাঠাও, সোনা জিতবে নিশ্চয়।

অমিত অলিম্পিকের বিষয়টা ভাল বুঝতে পারে না, ভাবে খরগোশের দৌড়ের মত কোন দৌড়ের ব্যাপার হবে। বলে—আচ্ছা, আমি ওল্ডবয়কে জিজ্ঞেস করব, যাবে কিনা।

আবার হাসির রোল। ইতিমধ্যে অমিতের মা এসে যোগ দিয়েছেন। অমিত বলে—মাকে জিজ্ঞেস করো, ওল্ডবয় কেমন ভালো বন্ধু।

বাবা জিজ্ঞেস করেন—তোমার সঙ্গে ওল্ডবয়ের আলাপ হয়েছে?

—হ্যাঁ। আমিই তো ওকে সেই দৌড়পাল্লার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

বাবা হাসতে হাসতে বলেন—দারুণ ব্যাপার! অমিত তো দেখছি এক জন ভি.ভি.আই.পি-র ইন্টারভিউ নিয়ে ফেলেছে। এ খবর নিশ্চয়ই বড় বড় হরফে কাগজে ছাপা হবে।

মা বলেন—তুমি দেশবিদেশের ভি.আই.পি-দের ইন্টারভিউ নিয়ে থাক, ছেলেও তেমনি অভ্যাস করছে।

বাবা বলেন—ঠিক ঠিক। তা মাননীয় ওল্ডবয় কী বললেন?

অমিত বলে—মাথা ঝাঁকিয়ে শুধু হাসলেন।

মা জিজ্ঞেস করেন—কেমন করে?

অমিত কচ্ছপের ঘাস চিবানোর অনুকরণে মাথা দোলাল।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন—বেশ! এবার তোমার বন্ধু ওল্ডবয়কে একদিন ডিনারে নিমন্ত্রণ করো। আমরা সবাই মিলে সেই বিখ্যাত দৌড়ের গল্পটা শুনব।

অমিত বলে—খুব ভালো হবে বাবা। আরো অনেক গল্প শুনতে পাব।

★ ★ ★ ★ ★

খাওয়াদাওয়ার পর অমিত তার শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের বাসাটি পাহাড়ের কিছুটা উঁচুতে। জানলা দিয়ে দূরের একটি বাড়ির নীল-সবুজ আলো দেখা যায়। রাত্রিতে চারিদিক শান্ত হলে পাহাড়ি ঝরণার ঝর ঝর শব্দ ভেসে এসে শূন্যস্থান ভরাট করে দেয়। ওই ঝরণাটা অমিত দেখেছে। পাহাড়ের ওপর পাথরের গা বেয়ে জলের ধারা নীচে নেমে আসে। উঁচু থেকে নীচের পাথরের ওপর জলের স্রোত যখন পড়ে, জলকণাগুলো ভাঙা কাচের টুকরোর মত ছিটকে ওঠে। তার ওপর সূর্যকিরণ পড়লে বাঁকা রামধনুর ছবি দেখা যায়। অমিত অনেক দিন সেখানে বসে শূন্যে রামধনুর রঙের বাহার দেখেছে।

বিছানায় শুয়ে প্রথমে ঝরণার শব্দে অমিতের রামধনুর কথা মনে হল। পরে মনে হল, ওই রকম জলে তো ডলফিন আর কচ্ছপ থাকতে পারে, যেমন সে দেখেছে সাগর-উদ্যানে। কতক্ষণ এই রকম চিন্তায় কেটেছে, খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখে তার বিছানার পাশে একটি সুশ্রী ছেলে দাঁড়িয়ে। ছেলেটির মুখ হাসি-হাসি।

সে বলে—অমিত, তোমার কাছেই এলাম, বুড়োকত্তামশাই পাঠিয়েছেন।

অমিত খানিক তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—আমি তো ভাই তোমাকে চিনতে পারলাম না! আর, বুড়োকত্তা কে, তাও তো জানিনে।

ছেলেটি হাসতে হাসতে বলে—বাঃ! আমাকে চিনতেই পারলে না? এই তো আজকেই দেখা হল সাগর-উদ্যানে। মায়ের সঙ্গে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে না? একটি চীনা মেয়ে তখন আমার সঙ্গে জলের মধ্যে খেলা করছিল, তুমি বুড়োকত্তামশাই-এর পিঠে চড়ে বেড়ালে। তাঁকে খাবার দিলে—এসব ভুলে গেলে?

অমিত ভালো করে চেয়ে দেখল, হঠাৎ মনে হল—ওঃ তাই বল, ছেলেটি মানুষের ছেলেই নয়, জলে সাঁতারকাটা ডলফিন! দেখাচ্ছে ঠিক সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতন। জিজ্ঞেস করল—ওল্ডবয়কে কি তোমরা বুড়োকত্তা বল?

—হ্যাঁ, কত্তামশাই সাগরের সব প্রাণীর গুরুদেব। কতবড় জ্ঞানী, জগতের সব খবর উনি জানেন। সাগরতলের সব রহস্য ওঁর জানা। তুমি ভারতের ছেলে, তাই তোমাকে উনি ভালোবাসেন। আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে।

কেন, আমি গেলে কী হবে? অমিত প্রশ্ন করে।

ছেলেটি উত্তর দেয়—তোমার সঙ্গে গল্প করবেন। জানো তো, বুড়ো মানুষ গল্প করতে ভালোবাসে। খুশি হয়ে তোমাকে কিছু উপহারও দিতে পারেন। ওই কর্তামশাই-ই তো সাগরের সমস্ত ধনরত্নের মালিক।

গল্প শুনতে পাবে শুনে অমিত খুশি হয়, বলে—বেশ, আমি যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু তোমাকে ভাই কী বলে ডাকব?



—কত্তামশাই আমাকে ডাকেন চিতন সরদার বলে। আমি তাঁর ফরমাশ মত কাজ করি, সবার আগে আগে চলি, মানুষেরাও আমাকে ভালোবাসে। 'চিতন সরদার' কত্তামশাই-এর দেওয়া আদরের নাম।

অমিত বলে—বেশ, চিতন সরদার, তুমি তবে আমার বন্ধু হলে। তুমি আমাকে কত্তামশাই-এর কাছে নিয়ে চলো। কিন্তু তাঁর জন্য তো কিছু খাবার নিতে হয়। কী নেব?

—কত্তামশাই সাধুপুরুষ, নিরামিষ খান। শাকসবজি, ফলমূল এই হল তাঁর খাদ্য।

—মায়ের ফ্রিজে যদি কিছু শাক থাকে, তাই নেব—বলে অমিত ফ্রিজ খুলে কিছুটা লেটুস পাতা বের করে আনল। তারপর চিতনের হাত ধরে বলল—চলো এবার। শব্দ করো না, মা জেগে উঠলে একা একা যেতে দেবেন না।

বাড়ি থেকে বের হয়ে দু'জনে পাহাড়ি ঝরণার ধারে গিয়ে উপস্থিত হল। স্বচ্ছ জল নেচে নেচে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। জলের ধারে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে চিতন অমিতের হাত ধরে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে অমিতকে তার পিঠের ওপর তুলে নিয়ে জলের সঙ্গে তরতর করে চলতে শুরু করল।

অমিত বলে—বাঃ বেশ মজা তো! আগে কখনো ঝরণার জলে ভেসে নীচে নামিনি। মনে হচ্ছে যেন লিফ্‌টে করে নামছি।

চিতন বলে—আর একটু পরেই আমরা সাগরে পড়বো। তখন সাবধান থেকো। রাত্রিতে যে-জাহাজগুলো নোঙর করে থাকে তার নাবিকেরা ফাঁদ পেতে আমাদের ধরবার চেষ্টা করে। কখনো কখনো ওপর থেকে জাল ছুঁড়ে দেয় আমাদের দিকে।

—তখন তোমরা কী করো?

—কেন, ডুব দিয়ে নীচের দিকে চলে যাই। তা ছাড়া, যখন চলি তখন এমনিতেই আমরা চারিদিকে এক রকমের শব্দের ঢেউ ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলি। তার প্রতিধ্বনিই আমাদের বলে দেয়, কোথায় কী আছে বা কত দূরে আছে। আসুক না আমাদের সঙ্গে জলের মধ্যে, দেখবো কার কত জোর,—বলে চিতন হাসতে থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চিতন আর অমিত ঝরণা বেয়ে সাগরে গিয়ে পৌঁছল। বন্দরে অনেকগুলি জাহাজ নোঙ্গর করা রয়েছে, কতক রয়েছে তীর থেকে একটু দূরে। জাহাজে লোকজনের সাড়াশব্দ নেই, দু'পাশ থেকে আলো এসে পড়েছে কালো জলের ওপর। দিনে সাগর দেখা যায় নীল, এখন যতদূর চোখ যায় যেন নিকষ কালো সমতল মাঠ। ওই কালো রঙের মধ্যে চলমান বড় বড় জোনাকির মত লালনীল আগুনের ফুলকিগুলো একবার জ্বলে, একবার নেভে। মনে হয়, সাগরকন্যারা দেওয়ালির রঙবাতি জ্বালাচ্ছে আর নেভাচ্ছে।

গল্পের আসর



অমিতকে নিয়ে চিতন যখন সাগর-উদ্যানে পৌঁছল তখন সেখানে গল্পের আসর বসেছে। পাড়াগাঁয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে যেমন কথক ঠাকুরকে ঘিরে শ্রোতার দল বসে, তেমনি উদ্যানের মাছ-ঘরের সামনে ঘাসের লনে জমাট সভা। ওল্ডবয় এখন আর চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে নেই, হাত-পা গুটিয়ে বসেছে, পিঠের খোলে চৌকো দাগগুলো স্পষ্ট বাদামি রঙের, মনে হয় গায়ে গেরুয়ারঙের নামাবলি। মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীর মত তার তেলতেলে মাথা চকচক করে। চোখে কৌতুকের হাসি।

ওল্ডবয়কে সামনে রেখে আধা-চাঁদের আকারে বসেছে জলের প্রাণীরা। মাছ-ঘরের সব মাছ এসেছে, গায়ে তাদের নানা রঙ, লাল নীল সবুজ কালো। কারো লম্বা দাড়ি, কারো

লম্বা কাঁচির মত ফলাওয়ালা দু'খানা পা শূন্যে তুলে কাগজ কাটার মত কচকচ শব্দ করে বলল—নিজের নিজের ঢাকপেটানো বন্ধ হোক। এদিকে বুড়োকত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অমিতের উপহার লেটুসপাতা কয়টা দেখে কত্তামশাই-এর মুখে জল এসে পড়েছিল। বুড়োমানুষের পক্ষে খাওয়ার লোভ দমন করাও কঠিন। মাছেরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করছিল সেই অবসরে কত্তামশাই চোখ বুঁজে লেটুসপাতা আরাম করে চিবোচ্ছিলেন।

কাঁকড়ার কথা কানে যেতেই চোখ খুলে একবার চেয়ে দেখে নিয়ে তিনি বললেন—শোন, শোন, আমাদের বংশের গৌরবের কাহিনী কূর্ম অবতারের কথা শোন।

মৎস্য অবতারের সেই বিরাট মাছ তো বহুযুগ পৃথিবীকে সাগরজলে রক্ষা করল। কিন্তু অত ভারি জিনিসটাকে ভাসিয়ে রাখা তো সোজা নয়! ধরণী আবার সমুদ্রের মধ্যে ডুবতে শুরু করল। তখন উপায়? জলের জীবের মধ্যে এমন কাউকে চাই যার জোর সব চাইতে বেশি আর যে তার পিঠের ওপর পৃথিবীকে রেখে সমানে ভেসে থাকতে পারে।

যোগ্য অবতার নির্বাচনের জন্য ভগবান বিষ্ণু সাগরের সমস্ত প্রাণীকে ডেকে এক বিরাট সমাবেশ ঘটালেন। সেখানে একে একে প্রার্থীদের যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখা হতে লাগল। প্রথমে দেখা হল মাছেদের। তাদের অনেকের পিঠের ওপর খাড়া কাঁটা। কাঁটা থাকলে চলবে না, পৃথিবী সেখানে আটকে যাবে। কারো পিঠ এমন সরু যে পৃথিবীর টাল সামলানো কঠিন। কাজেই চলবে না সেটাও। কাঁকড়ার পিঠ দেখা গেল বেশ শক্ত কিন্তু কাৎ হয়ে থাকে। ওখানে বসালে পৃথিবীও কাৎ হয়ে থাকবে, অতএব এ-ও অচল।

অবশেষে আমাদের বংশের একজনের পিঠে হাত বুলিয়ে ভগবান বিষ্ণু খুশি হয়ে বলে উঠলেন—পেয়েছি, পেয়েছি! এই হল পৃথিবী-বহনের যোগ্য বাহন।

আনন্দে ভগবান সেই মহাকূর্মের পিঠে উঠে দাঁড়ালেন, পরীক্ষা করে দেখবেন, তাঁর ভার বইতে পারে কিনা। ভগবান বিষ্ণুর পায়ের দাগ এখনো আমাদের পিঠের ওপর দেখতে পাবে।

চিংড়ি জিজ্ঞেস করে—তারপর কী হল?

—তারপর? তারপর ভগবান সেই মহাকূর্মকে আরো মহা-মহা করে দিলেন। পৃথিবী পিঠে বইতে হবে তো! শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীকে আবার জল থেকে উঁচু করেও রাখতে হবে। সেজন্য খুঁটি চাই। খুঁটি পোতা হবে কোথায়? শেষে ভগবান বিষ্ণু চারটি বিরাট বিরাট হাতি এনে সেই মহাকূর্মের পিঠের ওপর চারকোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ওই ঐরাবতরা শুঁড় দিয়ে পৃথিবীকে শূন্যে তুলে ধরল।

ভেটকি বলে—বাঃ! তাহলে এই যে বিশাল পৃথিবী, বিরাট হাতি—এদের সব ভার বইতে হল যে-কূর্মকে তিনি কি আপনারই ঠাকুরদাদা?



—না। তিনি আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদার, তাঁর ঠাকুরদাদার, তাঁর, তাঁর, তাঁর ঠাকুরদাদা। অনেক কালের কথা তো! তবে আমাদের বংশের সেই গৌরবের ধারা আমরা বহন করে চলেছি। মানুষ আমাদের পুজো করে, আর সাগরে তো তোমরা দেখছই—যেখানে যাই সেখানেই সম্মান।

কূর্মের পিঠে দাঁড়িয়ে চারটি হাতি পৃথিবীকে শূন্যে তুলে ধরে রেখেছে, একথা শুনে অমিতের মনে খটকা লাগল। সে বইতে পড়েছে পৃথিবী শূন্যে ঘোরে, সেইজন্যই দিন রাত হয়।

অমিত বলে—কত্তামশাই, আপনি বললেন, কূর্মের পিঠের ওপরকার হাতিরা পৃথিবীকে শূন্যে ধরে রেখেছে কিন্তু আমরা তো শুনি পৃথিবী শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?

বুড়োকত্তা হাসলেন, বললেন—ঠিক বলেছে অমিত। মানুষের ছেলে তো। তাই ও সব কিছুই জানতে চায়। তবে শোন, পৃথিবী স্থির থাকে—এ কথা সব মানুষই মনে করত প্রথম দিকে। তারা দেখত, পুবদিকে সূর্য ওঠে, পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। ভাবত, সূর্য পৃথিবীর একদিকে উদয় হয়ে সারাদিন চলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারপর পশ্চিম সাগরে ডুব দিয়ে স্নান করে বিশ্রাম নেয়। আবার পরদিন ভোরে পুবদিকে এসে হাজির হয়। সকলেরই ধারণা ছিল পৃথিবী সমতল, একটানা যে-কোন দিকে চলতে থাকলে শেষপ্রান্তে গিয়ে পৃথিবীর বাইরে পড়ে যেতে হবে।

লম্বা লেজ ময়ূরের পুচ্ছের মত ছড়ানো। জলের মধ্যে সদাই যারা ছুটোছুটি করে, এখানে তারাও শান্ত হয়ে বসেছে। চিংড়ি গৃহিনী রঙিন অ্যানটেনা দু'টি উঁচু করে তুলে নমস্কার করল, বলল—কত্তামশাই, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আপনার সেই ইতিহাস-বিখ্যাত দৌড়ের গল্পটা শুনতে চায়। জলের প্রাণীরা যে ডাঙার জীবের চাইতে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনিই তা প্রমাণ করেছেন। এ কাহিনী বহুবার শুনেও আমাদের আশ মেটে না।

কত্তামশাই চিংড়ি গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হাসলেন। গলা উঁচু করে শ্রোতাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন—

সেদিনের কথা মনে পড়লে এখনো আমার রোমাঞ্চ হয়। আড়াই হাজার বছর হয়ে গেল, কত নতুন ঘটনা ঘটতে দেখলাম কিন্তু ওই রকমটি জীবনে আর ঘটল না। তখন আমি ভূমধ্যসাগরে বাস করি। সেখানকার জল ঘন নীল, মহাসাগরের মত বড় বড় ঢেউ আর স্রোতের টান নেই, জল ঈষৎ উষ্ণ, আরামদায়ক। সাগরটা যেন এক বিরাট ঝিল, আমাদেরই জন্য তৈরি। গরমকালে গ্রিস দেশের পুব দিকে ঈজিয়ান সাগরে বেড়াতে যেতাম, সেখানে ছোটবড় অনেক দ্বীপ। পাষাণময় দ্বীপের ঢালু অংশ সাগরজলে এসে নেমেছে। সেই ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে রোদে পিঠ দিয়ে আরাম করে শুয়ে থাকতাম।

একদিন দুপুরে সেই দ্বীপে কচি কচি ঘাস তুলে খাচ্ছি, এমন সময় এক খরগোশ কোত্থেকে লাফ দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বলে—এ কেমন কথা? জলের জীব ডাঙায় এসে আমাদের খাবারে ভাগ বসাবে, তা তো চলবে না!



আমি বললাম—কী করতে হবে? তোমরা যদি পারো, যাও জলের মধ্যে গিয়ে খাবার খাও, আমরা কিচ্ছু বলব না। আমরা তোমাদের মত কৃপণ নই।

খরগোশ বলে—ডাঙার মালিক আমি, ডাঙার ভাগ চাইতে হলে আমার সঙ্গে তোমাকে লড়তে হবে, লড়াই করে জিততে হবে।

আমি বলি—আমি তোমার মত যোদ্ধা নই, তবু যদি তুমি চাও, এসো কুস্তি লড়ি। আমি হেরে গেলে তোমার ডাঙায় আর আসব না।



খরগোশ বলে—তুমি যদি কুস্তি লড়তে চাও তবে তোমার পিঠের আর বুকের বর্ম দু'খানা খুলে ফেলতে হবে। তা তো তুমি পারবে না! কাজেই, কুস্তি বাদ দাও, এসো বরং দৌড়ের পাল্লা দিই—বলেই তড়াক করে লাফ দিয়ে আমাকে দু'বার ডিঙিয়ে সামনে এসে বীরের মত দাঁড়িয়ে সে হাসতে লাগল।

আমি বললাম—বেশ, আমি রাজি। জলে বলো, ডাঙায় বলো, যেখানেই হোক আমি তৈরি। কোন মাঠে দৌড় হবে, দৌড়ের সীমানা কত দূর—এসব ঠিক করো।

খরগোশ বলে—এই তো মাঠ। এখান থেকে ওই যে এক মাইল দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘন পাতার জলপাইগাছ দেখতে পাচ্ছ, ওই পর্যন্ত সীমানা। যে আগে ওই গাছের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছবে, তারই জিৎ।

আমি বলি—কিন্তু দৌড়পাল্লার নিয়ম হল, কেউ একজন প্রতিযোগীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে সংকেত দেয়, তবেই দৌড় শুরু হয়। এখানে দৌড় শুরু করাবে কে?

খরগোশ মাথা চুলকোতে লাগল। সেখানে একটি ফুলের ওপর এক প্রজাপতি বসে আমাদের আলোচনা শুনছিল। সে বলে উঠল—কোন চিন্তা নেই, আমি তোমাদের দৌড় শুরু করিয়ে দেব। তোমাদের দু'জন এক লাইনে দাঁড়াবে, আমি তোমাদের সামনে শূন্যে উড়তে উড়তে যখনি ডানা দু'টি একত্র করে ফেলব, অমনি তোমাদের দৌড় শুরু করতে হবে।

খরগোশ বলে—বেশ তাই হবে, ঠিক ঠিক বিচার করো কিন্তু। আমার মতন তুমিও ডাঙার প্রাণী, এই বিদেশির পক্ষ নিয়ো না যেন। প্রজাপতি বলে—দু'পক্ষই আমার সমান, নইলে কি আর উড়তে পারতাম!

কবিদের মনের বাগানেও তো প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়, সে তাই কথা বলে বেশ গুছিয়ে।

দৌড়ের লাইন ঠিক করা হল। খরগোশ আর আমি লাইনের ওপর পা রেখে দাঁড়ালাম। প্রজাপতি পাশে, সামনে বারে বারে উড়ে দেখল, আমরা সোজা লাইনে দাঁড়িয়েছি কিনা। তারপর, উড়ে সামনে এল। আমরা ওর ওড়ার ভঙ্গি লক্ষ করছি; ডানা দু'টি সামনে দোলাচ্ছে। তারপর হঠাৎ এক সময় দুই হাতের দুই পতাকা একত্রে মাথার ওপর তুলে ধরার মত ডানা দু'টি পিঠের ওপর খাড়া করে তুলল। যতক্ষণ ডানা দোলাচ্ছিল, আমার বুক দুরদুর করছিল। তারপর দৌড় শুরু হতেই আমি জোর কদমে এগিয়ে চললাম। একবার চোখে পড়ল, বড় বড় লাফ দিয়ে খরগোশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তার দৌড়ের কী বহর! চার-পা একত্র করে মাটিতে ফেলে আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে, শূন্য দিয়ে, অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। আবার সেখান থেকে শূন্যে আরেক লম্ফ—এইভাবে সে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে লাফিয়ে চলে গেল।

এতক্ষণ শ্রোতারা নীরবে কত্তামশাই-এর গল্প শুনছিল। খরগোশ লাফিয়ে লাফিয়ে আগে চলে গেল শুনে চিংড়ির বাচ্চারা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—খরগোশ কি ফার্স্ট হয়ে গেল?

কত্তামশাই প্রকাণ্ড হাঁ করে হা-হা শব্দে হাসলেন। বললেন—এত সোজা হলে তো লোকে খরগোশকেই পুজো করত। সে লাফ দিল বটে, কিন্তু কতক্ষণ? দু'চার লাফ দিয়েই সে ভাবল, কেল্লা ফতে, জিতে গেছি। এখন খানিক বিশ্রাম করে নিই, তারপর ঘুম থেকে উঠে আবার দু'চার লাফ, ব্যস ওই জলপাইগাছের গোড়ায় পৌঁছে যাব। এই ভেবে সে ছোট এক ঝোপের পাশে বসে ঝিমোতে লাগল।

ইলিশ মাছের বাচ্চা জিজ্ঞেস করল—কত্তামশাই, আপনিও কি খানিক ঝিমিয়ে বিশ্রাম করে নিলেন?

কত্তা বলেন—না, আমার সংকল্প—ধীরে ধীরে চলব কিন্তু বাজি শেষ না করে থামব না। একটানা চলতে চলতে যখন সেই জলপাইগাছের কাছে পৌঁছলাম তখন হঠাৎ

খরগোশের ঘুম ভাঙল। সে পিছনে ফিরে দেখতে চাইল আমি কতদূরে পড়ে আছি। পিছনে আমাকে দেখতে না পেয়ে তাকালো সামনের দিকে। ততক্ষণে আমি জলপাইগাছের গোড়ায় গিয়ে ওর আসার জন্য অপেক্ষা করছি।

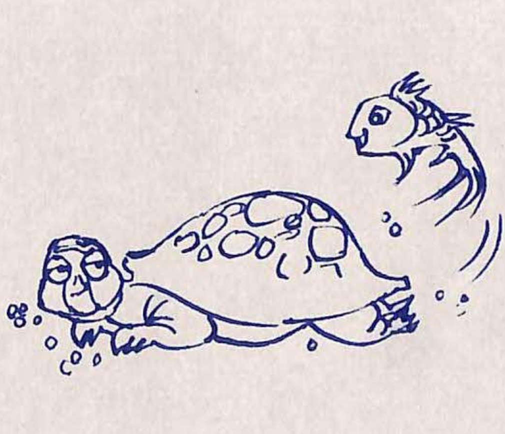
একথা শুনে শ্রোতারা সবাই হাততালি দিয়ে উল্লাস জানাল। কত্তা বললেন—তারপরে হল মজা। খাড়া কান দু'টি নিচু করে খরগোশ লজ্জাভরে কাছে এসে দাঁড়াল। তখন সেখানে অনেক দর্শক জমায়েত হয়েছে। চড়াই, বুলবুল, গাঙচিল, শালিক—সবাই। দ্বীপের মাছের রাজা মেছো-ঈগলকেও পাখিরা পুরস্কার দেবার জন্য ডেকে এনেছে।

দর্শকরা তখন পরামর্শ করে ঠিক করল, যেহেতু জলপাইগাছ লক্ষ করেই দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছে, তাই জলপাই-এর পল্লব পুরস্কার হিসেবে বিজয়ীর মাথায় মুকুটের মত পরিয়ে দেওয়াই ভালো। সঙ্গে সঙ্গে চকচকে পাতাওয়ালা সুন্দর একটি জলপাই-পল্লব এনে মেছো-ঈগল আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন এবং বললেন—এই বিজয় স্মরণীয় করে রাখার জন্য এরপর থেকে গ্রিসের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জলপাই-পল্লব দিয়ে বিজয়ীদের সম্মানিত করা হবে।

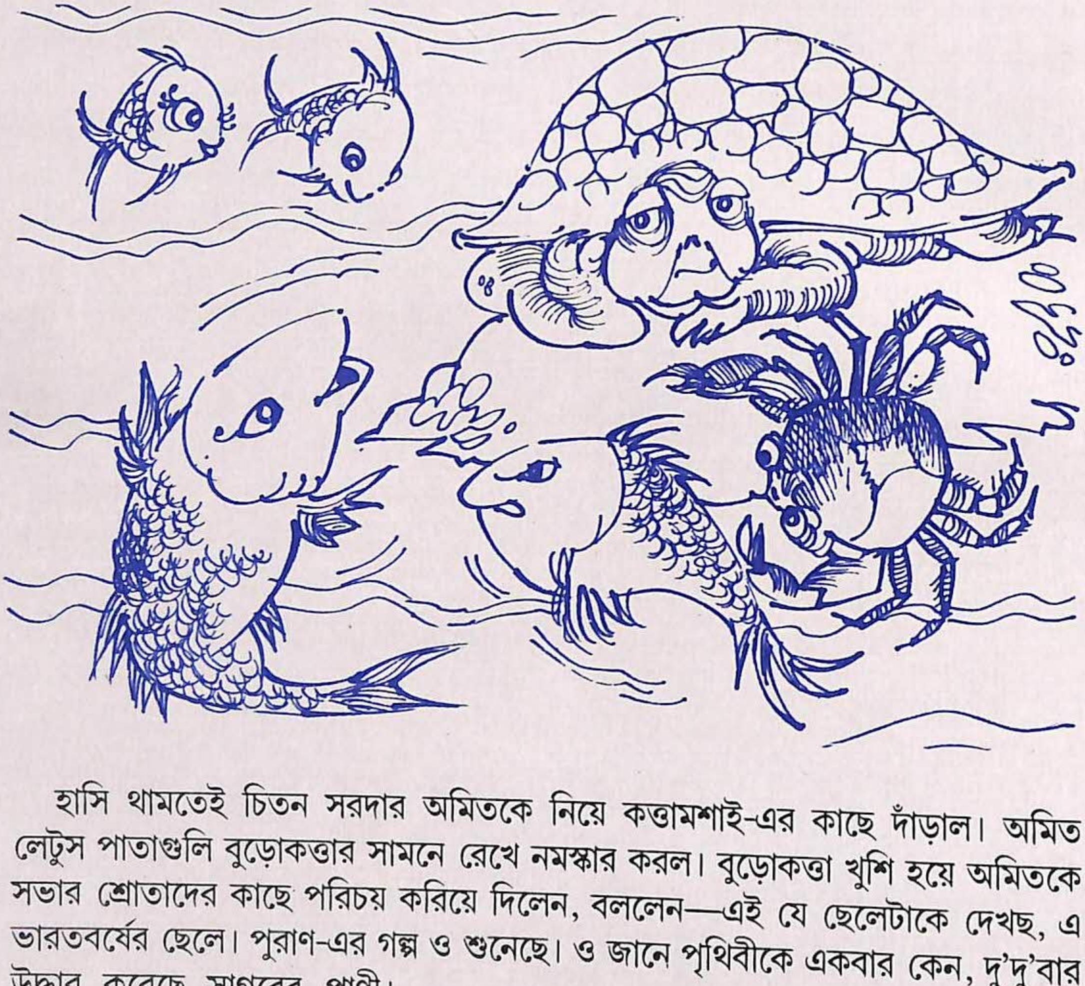
ভেটকি গৃহিণী জিজ্ঞেস করল—কত্তামশাই, সেই পুরস্কারটি কি সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখলেন?

কত্তামশাই হাসতে হাসতে বলেন—অতখানি পথ এক দমে চলে খিদে পেয়ে গিয়েছিল, আর রসাল জলপাইশাখা খেতেও সুস্বাদু। কাজেই, বুঝতেই পারছ, পুরস্কার কোথায় রাখলাম।

এ কথায় সভার সকলেই কত্তামশাই-এর সঙ্গে অট্টহাসি হাসতে লাগল।



কূর্ম অবতার



হাসি থামতেই চিতন সরদার অমিতকে নিয়ে কত্তামশাই-এর কাছে দাঁড়াল। অমিত লেটুস পাতাগুলি বুড়োকত্তার সামনে রেখে নমস্কার করল। বুড়োকত্তা খুশি হয়ে অমিতকে সভার শ্রোতাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন—এই যে ছেলেটাকে দেখছ, এ ভারতবর্ষের ছেলে। পুরাণ-এর গল্প ও শুনেছে। ও জানে পৃথিবীকে একবার কেন, দু'দু'বার উদ্ধার করেছে সাগরের প্রাণী।

ভেটকি বলে—তাই নাকি? তাহলে সেটা তো আমাদেরই গৌরবের বিষয়। আপনি সর্বজ্ঞ, সবকিছুই আপনার জানা। সেই গৌরবের ইতিহাসটা আমাদের বলুন।

বুড়োকত্তা—আচ্ছা, শোন। প্রথমবারে তো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একটানা বৃষ্টিপাতে পৃথিবী ডুবে গেল। সে বৃষ্টি কি যেমন তেমন? আকাশ ভেঙে যেন জল পড়তে লাগল। ভগবান বিষ্ণু এক মাছের রূপ ধরে সেই অথৈ জলে মানুষকে আশ্রয় দিলেন,

তাইতেই ডাঙার জীব রক্ষা পেল। বিষ্ণুকে হিন্দুরা অবতার বলে পুজো করে। সেই হল প্রথম অবতার—মৎস্য অবতার।

ভেটকি—কত্তামশাই, ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয়ই ভেটকিমাছের রূপ ধরেছিলেন?

ভেটকী গৃহিণী আর ইলিশ গৃহিণীর মধ্যে দারুণ রেষারেষি। ভেটকির ধারণা, মাছের জগতে সে-ই সব চাইতে সুন্দরী। আবার ইলিশ গর্ব করে, তার মত রূপসী আর কেউ নেই। ভেটকির কথা শুনে ইলিশপত্নী দাঁড়িয়ে উঠে বলে—ভেটকি কি আদৌ অবতার হওয়ার যোগ্য? ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয় মাছের মধ্যে যার রূপ সক্কলকে মুগ্ধ করে সেই ইলিশের রূপ ধরেছিলেন। তাই তো ভারতবর্ষ আমার মামাবাড়ি, আমার ছেলেমেয়েদেরও মামাবাড়ি। অমন দেশ আর কোথাও নেই।

চিংড়ির সবেতেই চটাং চটাং কথা। বলে—ইলিশের রূপ আছে মানলাম, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ তার গোষ্ঠীসুদ্ধ সবার মামাবাড়ি হবে কেন?

ইলিশ—কথাটা যখন উঠল, খুলেই বলি। ভারত-বাংলাদেশের সব বড় নদী—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা—যে-মিঠে জল নিয়ে আসে, ভেটকিদের সে-জলের স্বাদ নেওয়ার ভাগ্যই হয়নি। আর আমাদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, মিঠে জলের মধ্যে না ভাসলে ডিমগুলো চোখ মেলে তাকাবেই না। আমাদের তাই বছরে বছরে সাগর থেকে বাংলার নদীগুলোর উজানের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। সেখানে ডিম থেকে বেরিয়ে বাচ্চারা মিঠে জল খেতে খেতে সাগরে চলে আসে। কিন্তু মিঠে জলের কথা ভুলতে পারে না। লোনাজল ছেড়ে তাই তারা আবার মামাবাড়ি যাত্রা করে।

ভেটকি—আমাদের বাপু অত বিলাসিতা নেই। লোনাজলের মত জিনিস আছে? মিঠে জল যদি অতই স্বাদের তবে সেখানে বারোমাস থাকলেই পারে। আবার মরতে সাগরে আসা কেন?

তপসে মাছ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—বন্ধুগণ, কোথায় আমরা এখানে এলাম বুড়োকত্তার গল্প শোনার জন্যে, তা না শুরু হল ইলিশ-ভেটকি পরিবারের মামাবাড়ির গল্প, রূপগুণের চর্চা! তবে রূপের কথা যদি বলতেই হয়, আমি বলি, দাড়িগোঁফ না থাকলে আবার কারো রূপ খোলে নাকি?

এই বলে তপসে মিষ্টি মিষ্টি হেসে তার লম্বা গোঁফ টেনে টেনে আদর করতে লাগল। পরে মনে হল, কত্তামশাই-এর দাড়ি গোঁফ নেই, উনি রাগ করবেন না তো? তাই আবার বলল—অবশ্য বুড়ো কত্তামশাই-এর কথা আলাদা। ও রকম পিঠের অলংকার আর বুকের ঢাল ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

নিজের রূপ আর কাজের ক্ষমতা সম্বন্ধে কাঁকড়ার মনেও বেশ গর্ব। বুড়োকত্তার বর্ম বুকে-পিঠে, আর তার সারা দেহটাই তো বর্ম। হিংসুটে মাছেদের তা চোখে পড়ে না! কেউ কেউ তাকে অষ্টাবক্র মুনি বলে ঠাট্টা তামাশাও করে। ওদের ঝগড়াবিবাদ থামানোর জন্য

অমিত—তাহলে পৃথিবী গোলাকার হল কখন?

—কেন, তুমি তো জান, পুরাণের গল্পে আছে—কূর্ম অবতারের পর বিষ্ণু এক বরাহের রূপ ধরে পৃথিবীকে তার দাঁতের ওপর তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। আর পৃথিবী শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে গোল হয়ে গেল। তারপর থেকেই পৃথিবী দিনেরাতে একবার লাট্টুর মত ঘুরপাক খায়। আর এক বছরে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে তাকে নমস্কার করে আসে।

অমিত বলে—এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। আচ্ছা কত্তামশাই, সাগরজলের নীচে কী আছে আপনি তা দেখেছেন?

কত্তামশাই হো হো করে হেসে বলেন—সাগরের তলা তো আমাদেরই রাজ্য, দেখব না? সবই আমার দেখা, সবই জানা।

অমিত—মা-বাবার সঙ্গে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার সময় এরোপ্লেন থেকে আমি নীলসাগর দেখেছি, মনে হয়েছে তার বুঝি শেষ নেই। কিন্তু জলের নীচে কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। সাগরতলাটা ঘুরে দেখতে আমার ভারি ইচ্ছে। আমাকে দেখাবেন?

বুড়োকত্তা বলেন—বেশ, তোমাকে নিয়ে যাব, কী বলো চিতন?

ডলফিন চিতন সব কাজেই প্রস্তুত। বলে—বেশ, আমি তৈরি। অমিতকে নিয়ে সাগরতলের দেশ দেখিয়ে আনি, চলুন।

অমিত বলে—কিন্তু আমাকে আবার বাড়িতে পৌঁছে দেবে কে?

চিতন সরদার বলে—সেজন্য তোমার চিন্তা নেই, অমিত। আমি তোমাকে তোমার জায়গায় রেখে আসব।

অমিতের সাগর অভিযান শুরু হল। কত্তা বললেন—কী দেখতে চাও, বলো। সেই অনুসারে যাত্রা করি। সাগরের তলা ডাঙার দ্বিগুণের চাইতেও বেশি। কাজেই, একবারেই সব কিছু দেখা যাবে না। চিতন, কোথায় প্রথমে যাওয়া যায় বল তো?

চিতনের উত্তর দেবার আগেই অমিত বলে—এনডারসনের রূপকথায় যে-সাগরকন্যার গল্প আছে, প্রবালের রাজপুরীতে যে থাকে আর গোলাপি রঙের বাগানের মধ্যে বসে লম্বা চুল আঁচড়ায়—তাকে দেখা যাবে না?

কত্তা বলেন—সে তো অনেক দিনের কথা। চলো, দেখা যাক, সে-রাজার রাজত্ব এখনো আছে কিনা! পৃথিবীতে রাজাদের রাজ্যপাটই বা আর কোথায়? এখন তো সবাই রাজা!



রাজপুরীতে ডাইনী



সবে ভোর হয়েছে। পুব আকাশে গোলাপি আভা। ক্রমে সেই রঙ ওপরের দিকে নিঃশব্দে ছড়িয়ে যেতে লাগল। প্রশান্ত মহাসাগরের যে-অংশ পুব আকাশে মিশেছে তারই এক খানে জবাফুলের বিরাট একটি পাপড়ি দেখা গেল, শুধুই পাপড়ির প্রান্ত। তারপর, নীল জলের ওপর মোটা একটা সোনার পথ উজ্জ্বল হতে হতে হঠাৎ মনে হল জবাফুলটি পূর্ণবিকশিত, লাফ দিয়ে যেন আকাশের কিনারায় উঠে গেছে। সাগরে সূর্যোদয় হল।

ডলফিন বুড়োকত্তাকে বলল—সকালে যাত্রা করাই ভালো। চলুন, আমি অমিতকে পিঠে নিয়ে আগে আগে যাচ্ছি, আপনি পিছনে থেকে পথের নির্দেশ দিন।

কত্তামশাই বললেন—না, চিতন। দেখছ না, সাগরে ঢেউ রয়েছে, বেশি দোলা লাগলে

অমিতের অসুবিধা হবে। এখন বরং ও আমার পিঠেই থাকুক। পরে যখন নীচে শান্ত পুরীতে যাব, তখন তোমার কাছে রেখো।

চিতন বলে—বেশ, তাই হবে।

চিতনের হাসি খুশি ভাব আর কাজের উৎসাহ অমিতের ভালো লাগে। সে বুড়োকত্তাকে বলে—কত্তা মশাই, চিতন দেখছি খুব কাজের ছেলে। আমি দিদার কাছে গল্পে শুনেছি, আমাদের দেশে চিতন সরদার নামে এক ডাকাত ছিল। আপনার শিষ্য চিতনও কি সাগরের ডাকাত?

বুড়োকত্তা হাসতে লাগলেন, বললেন—না, না। চিতন সাগরে মানুষের বন্ধু। ডলফিনেরা দল বেঁধে থাকে। মানুষকে, বিশেষ করে ছোটদের, ওরা ভালোবাসে। সাগরে কেউ বিপদে পড়লে তাদের উদ্ধার করে ডাঙায় পৌঁছে দেয়।

অমিত বলে—ও হো, তাই তো, এখন মনে পড়ছে বটে! কাগজে একটা খবরও বেরিয়েছিল। বাবা বলেছিলেন আমাকে। ভিয়েৎনামের কাছাকাছি কোন সাগরে একবার এক যাত্রী-জাহাজে আগুন ধরে যায়। এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলেদের নিয়ে সেই জাহাজে যাচ্ছিলেন। এক সময় তিনি দেখলেন, আগুন থেকে জাহাজ কিছুতেই রক্ষা পাবে না। তখন তাঁর মনে হল, অন্তত আগুনের হাত থেকে তো ওরা আগে বাঁচুক! এই ভেবে, নিজের তিনটি ছেলেকেই তিনি পর পর জলে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তারপর....

বুড়োকত্তা বলে উঠলেন—দেখো কাণ্ড! সেদিন আমিও তো ওই জাহাজেরই কাছাকাছি ছিলাম। তা ছাড়া, যে-ডলফিনরা ছেলে তিনটিকে বাঁচাল, একটা নৌকোর কাছে পৌঁছে দিল, আমাদের এই চিতনই তো ছিল তাদের দলপতি! ওর এমন সাহস ও বুদ্ধির জন্যেই আমি ওকে বলি, চিতন 'সরদার'!

বুড়ো কত্তার মুখে নিজের প্রশংসা শুনে চিতন খুশিতে শূন্যে দু'বার ডিগবাজি খায়। কত্তা মশাইকে একবার চক্কর দিয়ে আসে, তারপর ফের চলতে থাকে।



সাগর উদ্যান থেকে রওনা হয়ে তিন জন দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে চলল। আগে আগে চিতন সরদার, তার মসৃণ নরম রূপোলি শরীর নীল জলের ভিতর দিয়ে অনায়াস ছন্দে তরতর করে চলে। পিছনে কত্তামশাই-এর পিঠে বসে অমিত ঢেউ-এর নাগরদোলায় একবার ওঠে আর নামে। দূর থেকে উঁচু হয়ে এসে ঢেউগুলো ফেনা মাথায় নিয়ে ভেঙে পড়ে, আবার শুরু হয় নতুন ঢেউ।

চিতন সরদার মাঝে মাঝে উঁচু ঢেউ ফুঁড়ে হুস করে বেরিয়ে জলের ওপরে লাফিয়ে ওঠে। বুড়োকত্তা তেমন পারেন না। তাঁকে ঢেউ-এর সঙ্গে ভেসে একবার ওপরে, একবার নীচে নামতে হয়।

কিছু দূর যাওয়ার পর বুড়োকত্তা বললেন—চিতন এবার চলো জলের তলা দিয়ে যাই, অশান্ত সাগরে ঢেউ-এর দোলানিতে কষ্ট হচ্ছে।

অমিতের কিন্তু ভালোই লাগছিল। বুড়োকত্তা চলেছেন জলের সমান সমান হয়ে। তাঁর পিঠে বসে অমিতের মনে হচ্ছিল, যেন সে সাবমেরিনের ছাতে বসে যাচ্ছে। ক্রমে ডাঙার রেখা দূরে মিলিয়ে গেল। চারদিকে কেবল জল আর জল। মাথার ওপর সামুদ্রিক পাখিগুলো চক্কর দিয়ে ওড়ে। ওরা ভেবেছে একটি মানুষের ছেলে সমুদ্রে অসহায় হয়ে ভেসে চলেছে। অমিত হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানায়।

চিতন আগে ডুব দেয়, পরে অমিতকে নিয়ে বুড়োকত্তা ধীরে ধীরে সাগরের তলায় নামতে থাকেন।

এক মুহূর্তের মধ্যে কেমন সব কিছু বদলে গেল! সাগরের ওপরের জল যখন ঢেউ-এ ঢেউ-এ অশান্ত, জলের নীচে তখন কোন আলোড়নই নেই। শান্ত স্বচ্ছ আবছা নীল জল, তার মধ্যে একটা রহস্যময় আলো। সূর্যের আলো ওপর-জলের মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করে। নীচের থেকেও কেমন একটা আলো আসে।

অমিত ওল্ডবয়ের পিঠে বসে নীচে নামতে নামতে দেখে ডাঙার পাহাড় জলের মধ্যে এসে ক্রমে আরো নীচে নেমে গেছে। সেই পাহাড়ের ধার দিয়ে ক্রমশ নীচের দিকে চলে যেতে যেতে অমিতের মনে হল সে যেন একটা প্রকাণ্ড পাখির পিঠে বসে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের উপত্যকার দিকে চলেছে। এ উপত্যকায় সবুজ ঘাস বিছানো নেই, রয়েছে রূপোর মত শুভ্র ঝকঝকে বালি, তার মধ্যে ছড়ানো সাতরঙা রামধনুরঙের ঝিনুক। সেগুলি থেকে আলো ঠিকরে ওঠে জলের মধ্যে। ওপরের আলোর চাইতে জলের তলাকার আলো অনেক কোমল, এতে চোখ ধাঁধায় না, কেমন একটা মায়াজাল বিস্তার করে।

সাগরের তলায় অমিত প্রথমে অবাক হল পাহাড় দেখে। সে ওল্ডবয়কে জিজ্ঞেস করে—কত্তামশাই, পাহাড় থাকে ডাঙায়, আকাশের দিকে, মেঘের দিকে মাথা উঁচু করে তোলে। এখানে পাহাড় সাগরজলে ডুব দিয়েছে কেন?

কত্তামশাই হাসেন, বলেন—তুমি তো জান না, সব পাহাড়ই একসময় জলে ডুবে ছিল। তোমরা যেমন স্নান করে ডাঙায় ওঠ, কতক পাহাড়ও তেমনি ডাঙায় উঠেছে, আর অনেকে এখনও ডুব দিয়েই রয়েছে। এরা একসময় ধীরে ধীরে জলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়াবে। কতক মাথা জাগিয়ে আবার ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। এরা সবাই শান্তশিষ্ট নয় কিন্তু, কতক ভীষণ রাগী, তাদের বুকের মধ্যে গনগনে আগুন।

হঠাৎ একটা মন্দিরের চূড়া অমিতের নজরে পড়ল। সে বলে—কী কাণ্ড! এখানেও মন্দির আছে? পুজো হয়? শঙ্খঘণ্টা বাজে?

বুড়োকত্তা বলেন—পুজো দেবে নাকি? ভালো করে দেখতো, কারা পুজো দিতে এসেছে!

অমিতের মনে হল রঙিন সিল্কের পোযাকপরা কতকগুলো ছোট মেয়ে মন্দিরের আশেপাশে, ভিতরে, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানোর মত ফুরফুর করে ঘুরছে, যেন তাদের গা থেকে উড়ছে শাদা সিল্কের ওড়না। খানিক কাছে গিয়ে দেখে, ওগুলো সব রঙিন মাছ, গায়ে নীল-হলুদ-সোনালি-লাল-কালো রঙের ছোপ, দীর্ঘ পাখনা ও পুচ্ছ রেশমী রুমালের মত ঝলমল করে। মন্দিরটি দেবমন্দির নয়। ধবধবে শাদা পাথরের গুহা, গুহার শিখরটি সরু হয়ে উঠে গেছে যেন কোন গীর্জার চূড়া।

চিতন মন্দিরগুহার এক মুখ দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে অমিতকে জিজ্ঞেস করে—কী, গুহামন্দিরের ভিতর যাবে?

কত্তামশাই চিতনকে হুঁশিয়ার করে দেন। বলেন—সাবধান চিতন, ডাইনীর নজর এড়িয়ে চলো। অমিতকে সঙ্গে নিতে চাও নাও কিন্তু চারিদিকে লক্ষ রেখো।

গুহামন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেখতে পাবে, এই আশায় অমিত উৎসাহের সঙ্গে চিতনের পিঠে গিয়ে বসল। কত্তামশাই মন্দিরের আশেপাশে নজর রাখতে লাগলেন।

চিতনের পিঠে বসে যেতে যেতে অমিতের মনে হল সাগররাজার সেই বাগানে এসে পড়েছে যেখানে রাজকন্যারা হাতধরাধরি করে ঘুরে বেড়াত। জলের মধ্যে স্নিগ্ধ নীলাভ আলো, মেঝেয় শুভ্র বালুকা বিছানো, তার ওপর এখানে ওখানে নীল ও সোনারঙের ঝিনুক পড়ে রয়েছে। যেন মুক্তোছড়ানো এক পথ বহুদূরে আবছা নীল অন্ধকারের দিকে চলে গেছে। পাহাড়ের গায়ে ও বাগানের মধ্যে শত শত রঙিন গাছ। মনে হয়, রাজার মালী কত যত্নে কেয়ারি করে বাগান তৈরি করেছে। মসৃণ পাথরের গায়ে তুলতুলে নরম শেওলার মতন জলজ উদ্ভিদ। নানা রঙের ছোট ছোট মাছ রঙিন মৌটুসি পাখির মত ঝাঁকে ঝাঁকে বাগানের মধ্যে ঘুরছে, কখনো নরম শেওলা টুকিয়ে টুকিয়ে খায়, কখনো মনের আনন্দে একে অন্যকে ধাওয়া করে গাছপালার ভিতর দিয়ে লুকোচুরি খেলে।

পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা, তার মুখে সবুজ লতার ঝালর পর্দার মত দোলে। গুহার ভিতরটা আবছা অন্ধকার। গুহার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় চিতন উঁকি দিয়ে

দেখল—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, গুহার ভিতরে দেওয়াল ঘেঁষে দু'টি ঘোলাটে শীতল চোখ বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে-চোখে পলক পড়ে না, যার চোখ সেও নড়াচড়া করেনা।

অমিত চিতনকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে—গুহার মধ্যে কি রাজকন্যা? চিতন ফিসফিস করে বলে—রাজকন্যা হলে লুকিয়ে থাকত না। মনে হয়, ডাইনী-রাক্ষসী শিকার ধরার জন্যে ঘাপটি মেরে রয়েছে।



অমিত বলে—তবে শীগগির পালাও।

চিতনের ভারি সাহস, বলে—না, পালাবো না। বরং একটু সরে গিয়ে আড়াল থেকে দেখি গুহা থেকে কে বেরিয়ে আসে।

চিতন গুহার মুখ থেকে সরে এসে একটা রঙিন গাছের কাছে দাঁড়াল। নজর রাখল গুহার ঝালর-পর্দার ফাঁক দিয়ে কেউ বের হয় কিনা। অনেকক্ষণ কেটে গেল। মাছের ঝাঁক আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা ঝাঁক চলেছে ঠিক ওই গুহার মুখ ঘেঁষে। মাছগুলির

গায়ের রঙে রূপালির ওপর গোলাপি আভা। মেঝেতে কয়েকটা নীল কাঁকড়ার বাচ্চা অদ্ভুতভাবে হাঁটছে। ওদের দেখে অমিতের হাসি পেল। গুহার কাছে কোথা থেকে একটা ছোট্ট লাল চিংড়ি পাথরের ফাটল থেকে বেরিয়ে মাছেদের দেখেই তাড়াতাড়ি লুকোবার চেষ্টা করে। ঝাঁকের শেষ মাছটি তাকে দেখতে পেয়ে দল থেকে এক ছুট দিয়ে ধরতে গেল। অমনি গুহার মুখের সবুজ ঝালর-পর্দার তলা দিয়ে সাপের মত কালো একখানা হাত বেরিয়ে এসে আলগোছে মাছটিকে জড়িয়ে ধরল। কে ধরল, কী ঘটতে যাচ্ছে বোঝার আগেই কে যেন ওই পর্দার ফাঁক দিয়ে গুহার মধ্যে তাকে টেনে নিল। মাছের ঝাঁকেরা টের পেল না, তাদের দলের একজন কমে গেল।



অমিত জীবজন্তুর বইতে পড়েছে, গভীর বনে ঝরণার ধারে গাছের ওপর লুকিয়ে পাইথন শিকার করে। কখনো সে বড় গাছ থেকে ডালের মত নীচের দিকে ঝুলে থাকে। বন্যজীবেরা জল খেতে আসে। পাইথনের সবুজ-হলুদ নক্সাকরা দেহ বনজঙ্গলের সঙ্গে বেমালুম মিশে থাকায় তারা বুঝতেই পারে না, যম কাছেই ওৎ পেতে রয়েছে। হরিণ বা অন্য কোন প্রাণী নাগালের মধ্যে এলেই পাইথন তাকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরে। পাইথনের কবল থেকে তার নিস্তার নেই। কখনও কখনও আক্রান্ত জীবের কাতরশব্দে অন্য প্রাণীরা জানতে পারে একজন প্রাণ হারাতে চলেছে।

কিন্তু এখানে গুহার মধ্যে যে মাছটি অদৃশ্য হল তার কোন আওয়াজ হল না। কেউ জানতেই পেল না। ওই সাপের মত হাতখানা কার, তা জানার জন্য অমিতের কৌতূহল হল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও—তাকেও নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরে ওই গুহার মধ্যে নিয়ে যাবে না তো?

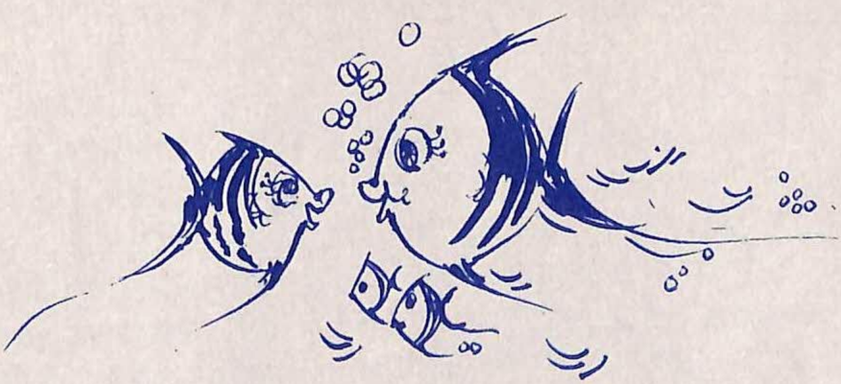
খানিক পরে গুহার লতা-পর্দার আড়াল থেকে কয়েকখানা আঁকাবাঁকা কালো সাপের মত হাত বেরিয়ে এল। তারপর কুৎসিৎ একটা মাথা, কাঁধের সঙ্গে লাগানো। চোখ দু'টি দেখলে বুকের মধ্যে দুরুদুরু করে।

কাঁধটা থলির মত দেহের সঙ্গে যুক্ত। হাতগুলো যখন ছড়িয়ে দিল, দেখা গেল সংখ্যায় আটখানা। এটি সমুদ্রের রাক্ষসী, অক্টোপাস। দেখতে মাথা-কাটা কবন্ধের মত।

অক্টোপাস যখন তার গুহা থেকে বেরিয়ে এসে জলের মধ্যে বাহুগুলি ছড়িয়ে দিয়ে ভাসতে লাগল, মনে হল এক বিরাট বাদুড় শূন্যে ভাসছে। তার ডানার সঙ্গে লাগানো আটখানা বাহু হাতির শুঁড়ের মত নরম মাংসপেশি দিয়ে তৈরি। জন্তুটা এমনই কুৎসিৎ কদাকার যে ছোটরা হঠাৎ দেখলে আঁৎকে উঠবে।

অমিত বলল—চিতন ভাই, একটু আড়ালে চলো, রাক্ষসীটা যেন আমাদের দেখতে না পায়। রূপকথায় পড়েছি রাক্ষসীরা হাতি ঘোড়া ধরে ধরে খায়। এই রাক্ষসীও কি তাই করে?

চিতন বলে—চলো, বুড়োকত্তামশাই-এর কাছে রাক্ষসীর গল্প শোনা যাবে। আর, যদি সুযোগ হয়, এর যুদ্ধও দেখা যেতে পারে।



অক্টোপাসের বাড়িতে



একটা ঝোপের আড়াল থেকে অমিত অবাক চোখে অক্টোপাস-রাক্ষসীকে দেখতে লাগল। গুহার মধ্যে বসে সে সবে ভোজন শেষ করে এসেছে, মেজাজ তাই খুশ। মাথা ঘিরে কুলোর মত যে-পর্দা সেটা প্যারাসুটের মত ছড়িয়ে দিয়ে অক্টোপাস জলের মধ্যে ভাসছে। আটখানা বাহুর সরু আগাগুলি অল্প অল্প নড়ে। প্যারাসুটে মাথাটা ঢাকা পড়েছে, বোঝা যায় না কোন দিকে চেয়ে আছে। অমিত বুড়োকত্তাকে বলে—কত্তামশাই, আমরা যে-রাক্ষসীর কথা উপকথাতে পড়ি তারা রাত্রিতে খাবারের সন্ধানে বেরয়। তারা মায়াবিনী, নানা রকমের রূপ ধারণ করতে পারে—কখনো সুন্দরী নারী, কখনো ভয়ংকরী চামুণ্ডা। সাগরের রাক্ষসী কি ওই রকম রূপ বদলায়?

বুড়োকত্তা অমিতকে বলেন—ওই দেখ, তোমার সামনেই রাক্ষসী গায়ের রঙ পালটাচ্ছে।

সত্যি তো! দেখতে দেখতে অক্টোপাসের গায়ের কালো রঙ নীল মতন হয়ে জলের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। যখন যেখানে তখন সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে মিশে থাকার জন্য অক্টোপাস কখনো কালো, কখনো নীল, কখনো লাল হয়ে যায়। অতর্কিতে খাবার ধরার কৌশল হিসাবেই তার এই রঙ বদল। যাতে অন্য প্রাণীরা সহজে বুঝতে না পারে যে, যম কাছেই আছে।

অমিত বলে—রাক্ষসীর মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। ওর দাঁতগুলো কেমন? বড় বড় মুলোর মতন?

বুড়োকত্তা বলেন—আরো একটু নীচের দিকে নামো, তাহলে অক্টোপাসের মুখটা ভাল করে দেখতে পাবে।

খানিক নীচে নেমে কত্তামশাই বলেন—ওই দেখো, রাক্ষসীর মুখ। দু'টো ঠোঁট, টিয়াপাখির ঠোঁটের মত শক্ত, ধারালো হাড় দিয়ে তৈরি। দাঁত নেই, ঠোঁট দিয়েই সে মাংস ছিঁড়তে পারে। ভাঙা কাচের মত ধারালো কাঁটাওয়ালা জিভ; শঙ্খ বা ঝিনুক ঠোঁট দিয়ে ভেঙে তার শাঁসের অংশ জিভ দিয়ে কুরে কুরে খায়। আর ওই যে হাতগুলো দেখছ, এখন জলের মধ্যে এলানো রয়েছে, ওতে প্রচণ্ড শক্তি।

অমিত—রাক্ষসীর হাতে হাড় আছে বলে তো মনে হয় না। এত শক্তি ও পায় কোথা থেকে?

বুড়োকত্তা—বাহুগুলো লক্ষ করো। মাথার ওপর থেকে বেড়ে ক্রমে সরু হয়ে গেছে। প্রতি বাহুতে ১২০ জোড়া করে শোষক নল রয়েছে। বাহু ফাঁপা, শোষক নলগুলোও ফাঁপা, এদের গোড়ায় আছে ভাল্‌ভের মত মাংসপেশি। কাউকে যখন ধরে, তখন ওই শোষকগুলির মুখ এমনভাবে বন্ধ করে দেয় যে, বাহুর বাঁধন কিছুতেই খোলা যাবে না। অক্টোপাস যদি ইচ্ছা করে বাঁধন খুলে না দেয়, আর যাকে ধরেছে সে যদি ওর চাইতে বেশি শক্তিশালী হয়, তবে বাহু ছিঁড়ে যাবে কিন্তু খুলবে না।

অমিত খুশি হয়ে বলে—বাঃ! তবে তো ভালোই, হাত-ছেঁড়া রাক্ষসীকে আর শিকার ধরতে হবে না! না খেয়েই ও মারা পড়বে।

বুড়োকত্তা হেসে বলেন—তোমাদের রূপকথাতে নাকি এমন রাক্ষসীর গল্প আছে, হাত পা কেটে ফেললেও যে মরে না! তার প্রাণভোমরা, কৌটোর মধ্যে যে-কৌটো, সেখানে লুকানো থাকে। সাগরের রাক্ষসীর প্রাণ অবশ্য তেমন কোন ঝাঁপি-কৌটোয় নেই। তবে, হাত টাত ছিঁড়ে গেলে কয়েকদিনেরই যা অসুবিধা, না হলে ওইসব শোষক-নল সমেত তার নতুন হাত আবার গজায়।

অমিত বলে—চণ্ডীর গল্পে এই রকম সব দৈত্যের কথা আছে। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মাথা কাটা গেলেও তাদের নতুন মাথা গজাত, এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে তা থেকে আবার নতুন অসুর সৃষ্টি হত। অক্টোপাস দেখছি কতকটা সেই ধরনেরই রাক্ষস। এদের তাহলে বিনাশ নেই?

বুড়োকত্তা বলেন—বিনাশ নেই তা নয়। এদের সঙ্গে লড়াই করে এদের মেরে খেয়ে ফেলার মত প্রাণী সাগরেই আছে। আর এরা যখন ছোট থাকে তখন এদের মিষ্টি মাংস খাওয়ার লোভ হয় অনেক জীবের। তারা ছোট ছোট অক্টোপাস ধরে খায় কিন্তু বড়দের দেখে ভয়ে পালায়।

অমিত ছোট অক্টোপাস দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদের তো আর ভয় করার কিছু নেই। তাছাড়া, সাগর থেকে অদ্ভুত কিছু একটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে সে মাকে অবাক করে দিতেও চায়। বুড়োকত্তাকে বলে—কত্তামশাই, অক্টোপাস-রাক্ষসের বাচ্চা আমাকে দেখান না! কোথায় ওদের বাড়ি? ওদের একটাকে ধরে কি আমাদের বাড়িতে নিতে পারব?



বুড়োকত্তা বলেন—পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে অক্টোপাস ডিম পেড়ে দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। রাক্ষসী সেখানে বসে পাহারা দেয়, যাতে কেউ তার ডিমগুলো খেয়ে না ফেলে। পঞ্চাশ দিন পরে ডিমগুলো ফুটে ক্ষুদে ক্ষুদে রাক্ষসের বাচ্চা বেরয়। এই সময়, মাঝে মধ্যে, রাক্ষসী নিজের খাবার সংগ্রহ করার জন্য গুহার কাছে পিঠেই কোথাও বাইরে যায়। সেই সুযোগে তোমাকে ওর বাসা দেখাব, চলো।

খুব সতর্ক হয়ে কিছুদূর গিয়ে বুড়োকত্তা একটা গুহার মুখে উঁকি দিয়ে দেখে চিতনকে বলেন—চিতন, এ গুহা থেকে রাক্ষসী বাইরে গেছে, হয়ত শীগগিরই ফিরবে। তুমি গুহার মুখে পাহারায় থাকো, আমি অমিতকে নিয়ে ভিতরে যাই। রাক্ষসীকে দূর থেকে দেখতে পেলেই সংকেত দিয়ো।

চিতন অক্টোপাসের গুহার মুখে পাহারা দিতে লাগল, বুড়োকত্তা অমিতকে নিয়ে ভিতরে গেলেন। অন্ধকার গুহার মেঝেতে শঙ্খ, ঝিনুক ও মাছের হাড় গোড় ছড়ানো। গুহার ছাদের সঙ্গে দেওয়াল ঘেঁসে লাগানো রয়েছে অনেকগুলি আঙুরের থোকা।



অমিত বিস্মিত হয়ে বলে—গুহার মধ্যে আঙুর ফলেছে? তবে তো তুলে নিয়ে খাওয়া চলে!

বুড়োকত্তা হাসতে হাসতে বলেন—তোমার দাদুর বাড়ির গাছের আঙুর নয় কিন্তু। এ হল জ্যান্ত আঙুর। রাক্ষসীর ডিম।

অমিত ভাল করে দেখে বলে—এত ডিম?

বুড়োকত্তা বলেন—এই যে ৪০/৫০টি থোকা দেখছ, এর প্রত্যেকটিতে আছে আট থেকে নয় শ ডিম। এখন হিসেব করে দেখ। একবারেই রাক্ষসীর বাচ্চা হয় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার!

অমিত বলে—এইভাবে যদি রাক্ষসের দল বাড়তে থাকে তবে সমস্ত সাগর তো ওরাই দখল করে নেবে! ডিম ফোটানোর জন্য ওদের মা কী করে? বাচ্চা বের হলে ওদের কী খাওয়ায়?

বুড়োকত্তা—অক্টোপাস যখন ডিম নিয়ে গুহায় থাকে তখন ওর ভয়ংকর মেজাজ। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। অন্য প্রাণী দূরে থাক ওর স্বামীও গুহায় যেতে সাহস পায় না। হয়ত তার হাত ছিঁড়ে দেবে। রাক্ষসীর সন্তানস্নেহ খুবই প্রবল। মাঝে মাঝে ডিমের থোকাগুলো সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। তার মধ্যে জলের ঝাপটা দিয়ে অক্সিজেন চালিয়ে দেয় যাতে ডিম পুষ্ট হয়, বাচ্চা সতেজ হয়ে উঠতে পারে। অবশেষে ডিমগুলো ফুটে হাজার হাজার ক্ষুদে রাক্ষস কিলবিল করে গুহা ভরে ফেলে। তখন রাক্ষসীর কী আনন্দ!

অমিত—রাক্ষসী তখন বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায় না?

—না। বাচ্চাদের বলে—যাও, বিশাল সাগর তোমাদের রাজ্য, সেখানে নিজের খাবার যোগাড় করে খাও। বাচ্চারা সাঁতার কাটতে কাটতে আকাশ দেখার জন্য জলের ওপরে ভেসে ওঠে। সেখানে অসংখ্য ছোট ছোট প্রাণী আছে, যেগুলো রাক্ষসের বাচ্চাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। আবার সেখানে অনেক মাছও আছে যাদের কাছে এই বাচ্চারাই বোঁদে-মিহিদানার মত রসাল মিষ্টি খাবার। কাজেই সাগরের জলের ওপর তখন ভোজ উৎসব চলে। এদের মধ্যে যারা বেঁচে যায় তারা সাগরের তলায় চলে আসে। এখানে ওরা অনেকটা নিরাপদ। আর, বড় হয়ে গেলে তো ওদের ভয়েই অন্যরা অস্থির।

অমিত জিজ্ঞেস করে—অক্টোপাস কত বড় হয়?

—সাগরে অক্টোপাস আছে প্রায় ৩৬ রকমের। সবচেয়ে ছোট জাতের অক্টোপাস মাত্র দেড় ইঞ্চি লম্বা। ভারত মহাসাগরে এই গোষ্ঠী দেখা যায়। আর সব চাইতে বড় আকারের অক্টোপাস, যাকে বলা হয় 'দানব অক্টোপাস', তার বাহুর দৈর্ঘ ৩২ ফুট। আলাস্কার কাছাকাছি সাগরে এদের দেখা মেলে।

অক্টোপাসের বাহু ৩২ ফুট দীর্ঘ হয় শুনে অমিতের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে যায়।

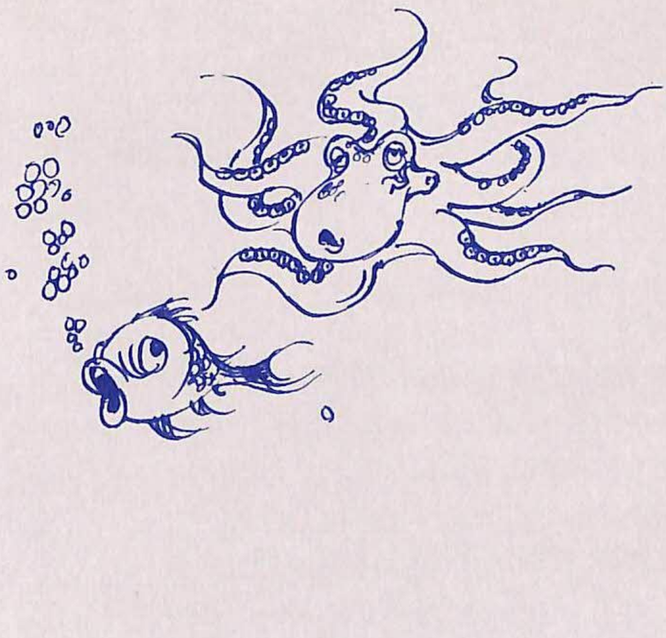
বলে—কী কাণ্ড! সেই অক্টোপাস-রাক্ষস তো তাহলে একটা হাতিকেও পেঁচিয়ে ধরে জলে ডুবিয়ে নিতে পারে?

—হ্যাঁ, তা তো পারেই। অবশ্য, সাগরে ডাঙার হাতি নেই। সাগরের সব চাইতে ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী হল হাঙর। অক্টোপাস তার সঙ্গেও যুদ্ধ করতে ভয় পায় না।

এই সময় চিতন বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠল—রাক্ষসীর জটা দেখা যাচ্ছে। শীগগির বেরিয়ে পালাও।

একটা লতার আড়াল দিয়ে বুড়োকত্তা অমিতকে নিয়ে বেরিয়ে একপাশে সরে গেলেন। ভাগ্য ভালো, রাক্ষসীর চোখে পড়েনি। রাক্ষসী গুহার মধ্যে ঢুকে যেতেই অমিত বলল—অক্টোপাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে যে-হাঙর তার দেখা পাব না?

বুড়োকত্তা উত্তর দেন—দেখা পাবে নিশ্চয়ই। দিনের বেলায় অক্টোপাস জলের তলায় গুহায় লুকিয়ে থাকে। কাছাকাছি কেউ এলে তাকে ধরে টিফিন বানায়। রাত্তিরে ওরা জলের ওপর তলায় চলে আসে। সেখানে চলে খাবার যোগাড়ের বড় অভিযান। গল্পের রাক্ষসীর মত সাগরের রাক্ষসীরাও নিশাচরী। চলো সেইখানে যাই, হয়ত হাঙরের দেখা মিলবে। খুব সাবধান থাকতে হবে কিন্তু।



বাঘের শিকার ধরা



সেদিন পূর্ণিমা রাত। কিছুক্ষণ আগে পুব আকাশে চাঁদ উঠেছে। বুড়োকত্তা, চিতন আর অমিত যখন সাগরের ওপর ভেসে উঠল তখন অপূর্ব আলোছায়ার খেলা চলেছে সাগরের বুকে। পরিপূর্ণ চাঁদের রূপালি কিরণ ঢেউ-এর সঙ্গে শিশুর দোলনার মত দুলছে, সে-ঢেউ একবার দেখায় ঝকঝকে শাদা, একবার মিশমিশে কালো। শাদা-কালো রঙের গায়ে চুমকির মত লাল-নীল-সবুজ আলোর ফুটকি। মনে হয়, হীরে-চুনি-পান্না বসানো বহুমূল্য একখানা বিরাট ওড়না জলের ওপর মেলে দেওয়া হয়েছে।

অমিত এই দৃশ্যের দিকে চেয়ে আছে এমন সময় চিতন ভয় পেয়ে বলল—কত্তামশাই, শীগগির এখান থেকে সরে আসুন, নইলে আমরা কিন্তু বাঘবন্দি হয়ে পড়ব।

বাঘবন্দি কেমন, অমিত বুঝতে পারল না। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে—চিতন, আমরা যে ঘুঁটি দিয়ে বাঘবন্দি খেলি, সেই রকম খেলা?

অমিতের কথা শুনে চিতনের হাসি পেল, বলল—এ মিছিমিছি 'বন্দি' করার খেলা নয়, জীবন নিয়ে খেলা। ওই দেখো, একটা বিরাট হাঙর আমাদের চারিদিকে গণ্ডি টানার মত ঘুরে জলের ওপর দাগ টানছে আর লেজের ঝাপটে জল তোলপাড় করছে।

হাঙরটা একদিকে সরে যেতেই বুড়োকত্তা চিতনের পিছু পিছু কিছুটা দূরে গিয়ে দেখতে লাগলেন, হাঙর গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে চক্রপথের পরিধি ক্রমেই ছোট করে আনছে।

বিরাট এক ঝাঁক মাছ চলেছিল জ্যোৎস্নার আলোয়, মনের আনন্দে। হঠাৎ নজরে পড়ে গেছে থ্রেসার হাঙরটির। থ্রেসার মাছের যম। ধূর্ত বাঘের মত সে মাছের ঝাঁক অনুসরণ করে দ্রুতগতিতে ছুটে ওদের চারিদিকে বেড়াজাল সৃষ্টি করে। মাছেরা ভয় পেয়ে সবাই কাছাকাছি হয়ে যায়। বাঘ যদি ভেড়ার পালের চারিদিকে বেগে দৌড়িয়ে ওদের পালানোর পথ বন্ধ করে দেয় তখন যেমন ওরা গায়ে গায়ে লেগে প্রাণ বাঁচাবার কথা চিন্তা করে, মাছেদের হল সেই অবস্থা। হাঙর ওদের ঘিরে ছুটছে আর লেজের ঝাপটায় জল তোলপাড় করছে। তারপর শুরু হল রাক্ষুসে খাওয়া। প্রকাণ্ড জানোয়ারটা এক এক গ্রাসে ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ মুখে নিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলতে লাগল। এপাশ ওপাশ দিয়ে মাছ পালাতে চেষ্টা করে। হাঙরটা লম্বা বৈঠার মত লেজ দিয়ে তাদের তুলে নিজের মুখের সামনে এনে ছিটকে ছিটকে ফেলে। কারো নিস্তার নেই।

অমিত বুড়োকত্তাকে অনুরোধ করে—কত্তামশাই, আপনি তো সাগরের সব প্রাণীর পরিচয়ই জানেন। হাঙরদের কথা কিছু বলুন না।

বুড়োকত্তা—এখানে যে-হাঙরের মাছের ঝাঁক ঘিরে ধরে খাওয়া দেখলে এটি 'থ্রেসার' বলে পরিচিত। অবশ্য এ নাম মানুষই দিয়েছে। ওরা নিজেরা রাখেনি। চাষী যেমন পাকা ধান মাটিতে বা কাঠের তক্তার ওপর পিটিয়ে ঝাড়াই করে, এই হাঙরও তেমনি তার লম্বা উঁচু লেজ জলে পিটিয়ে ঝাঁকের মাছেদের তাড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে। তারপর খাওয়ার সময় ওই লেজ বিরাট হাতার মত ব্যবহার করে আশেপাশের মাছ তুলে মুখের সামনে আনে। মানুষ তাই এই চতুর হাঙরের নাম দিয়েছে 'ঝাড়াইকারী' হাঙর।

অমিত—থ্রেসার হাঙর কী ভাবে মাছ ঝাড়াই করে, তা তো চোখের সামনেই দেখলাম। ওর চলাফেরা দেখে মনে হয় ওর শরীরে হাড় নেই, কেমন অনায়াসে দেহটাকে এদিক-ওদিকে বাঁকায়, যেন একখানা বেতের চাবুক!

বুড়োকত্তা—ঠিকই বলেছ। থ্রেসার হাঙরের দেহে শক্ত হাড় নেই, আছে নমনীয় হাড়, মানুষের কান ও নাকের ডগার নরম হাড়ের মতন, যাকে বলে কার্টিলেজ। এর ফ্যাকাশে-শাদা রঙ, পুরু মসৃণ চামড়া, দেহের গড়ন জলের মধ্যে বেগে ছুটে চলার উপযোগী। সামনের দু'খানা বড় পাখনা দাঁড়ের মত জল টেনে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে তাকে

সাহায্য করে। পিঠের ওপর দাঁড়ানো নিশানের মত পাখনা আর লেজ তার হালের কাজ করে। বিরাট লেজ চলায় গতিবেগ আনে ও শিকার ধরার সহায়ক হয়। ভয়ঙ্কর হল হাঙরের মুখ। ওপরের চোয়ালটা ভারি ও সামনের দিকে আগানো। নীচের চোয়াল নেই বললেই চলে, তাই মুখটা পেটের দিকে অনেক সরে গেছে মনে হয়। মুখে ৩ থেকে ৬ সারি তেশিরা ধারালো দাঁত। মুখটা নীচের দিকে হওয়ায় হাঙর অনেক সময় চিৎ হয়ে খাবার ধরে, তখন খাদ্যবস্তুকে মুখের কায়দায় আনা সহজ হয়।

অমিত—সব হাঙরই কি এই রকম?

—না। সাগরের তিনটি প্রধান জাতের হাঙর আছে। এদের মধ্যে তিমি-হাঙর সব চাইতে বড়, লম্বায় ৫০ ফুট পর্যন্ত হয়। তবে তিমি-হাঙর মানুষের ক্ষতি করে না। তারা মুখের ভিতরকার এক ধরনের ছাকনি যন্ত্র দিয়ে সমুদ্রের খুব মিহি প্রাণী ধরে খায়। অন্য সব হাঙর রাক্ষুসে ধরনের মাংসলোভী। সীল, বড়মাছ, সাগরের কচ্ছপ এমনকি মানুষ পেলেও এরা ছাড়ে না। থ্রেসার এই শ্রেণীর। এরা কখনো কখনো ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, থ্রেসারের বিশেষত্ব হল লম্বা লেজ।

অমিত—হাঙরের চোখের পিছন দিকে পাখনার ওপরে কয়েকটি লম্বা রক্তের দাগ দেখলাম। হাঙরটা লড়াই করতে গিয়ে মনে হয় জখম হয়েছে।

বুড়োকত্তা হাসেন, বলেন—হাঙরকে জখম করা সহজ নয়। তুমি যা দেখেছ ওগুলো রক্তের দাগ নয়, পাঁচ-ছয় সারি কানকো। মাছের দু'টি কানকো থাকে মুখের দুই পাশে ঢাকনা দিয়ে ঢাকা; হাঙরের কানকো খোলা পিঠ থেকে নীচের দিকে পাশাপাশি কয়েক সারি। মুখের ভিতর জল নিয়ে কানকো দিয়ে বের করে দেওয়ার সময় সে বাতাস ছেকে রাখে। চোখ দু'টি লক্ষ করে দেখেছ? স্পষ্ট, বড় বড়, ঘোলাটে। বলা যায়, বাঘের চোখ।

অমিত—থ্রেসার হাঙর কি কেবল মাছ খায়?

—না না। ওর মত রাক্ষস সাগরে আর দু'টি নেই। লোকে ওর নাম দিয়েছে বাঘ আর শকুনি।

অমিত—কেন? শকুনি কেন? ও কি উড়তে পারে?

—না। বাঘ জন্তু শিকার করে খায়, হাঙর বাঘের মত শিকার করে আবার শকুনির মত মরা জানোয়ারও খায়। এই থ্রেসার এত লোভী যে, যাত্রী-জাহাজের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। জাহাজ থেকে কিছু জলে ফেললে বা পড়লেই হল। এমন কি টিনের কৌটো হলে তা-ও সে গিলে ফেলবে। জেলেরা হয়ত জালে মাছ আটকিয়েছে। থ্রেসার তা দেখতে পেলে জালসুদ্ধই সব মাছ খেয়ে ফেলবে। এমন লোভ!

অমিত—যে-হাঙরটা মাছ ধরে খাচ্ছিল তার পেটের পাশে একটা ছোট্ট হাঙর লেগে আছে দেখলাম। ওটা কি হাঙরের বাচ্চা, অনেক সময় মেয়েরা যেমন কচি ছেলেমেয়ে পিঠে বেঁধে নিয়ে ঘোরে, তেমনি?

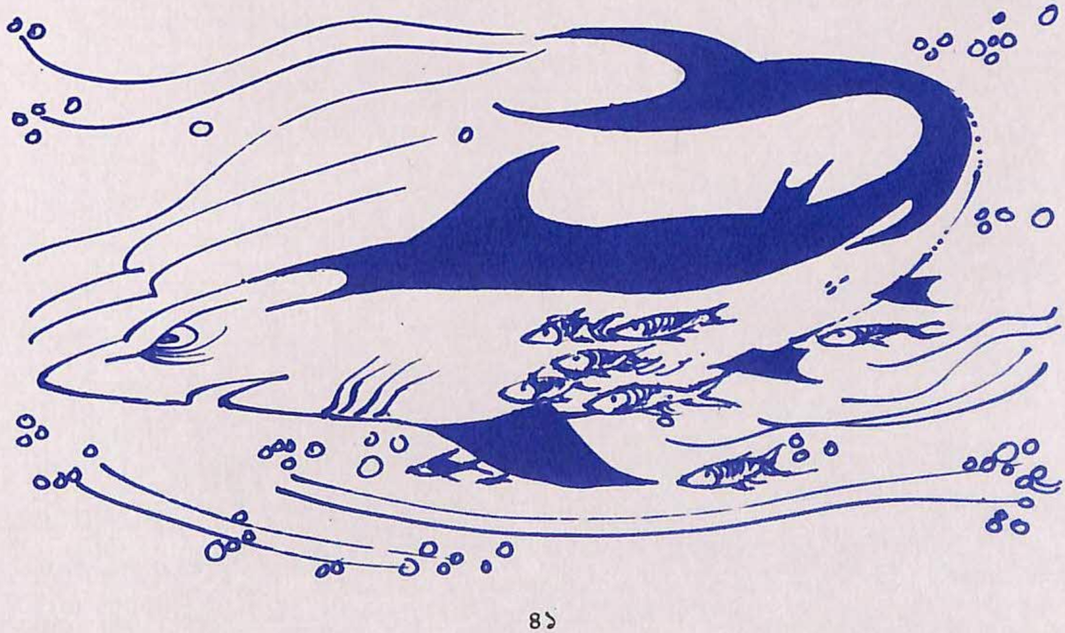
পেটের সঙ্গে বাঁধা হাঙরের বাচ্চা কিনা শুনে চিতন হো হো করে হাসতে লাগল।

অমিত জিজ্ঞেস করে—এত হাসছ কেন?

চিতন বলে—তোমাদের মধ্যে একটা কথা আছে না, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? এখানে তেমনি ব্যাপার ঘটেছে। হাঙরের গায়ে যে-মাছটি সেঁটে রয়েছে সেটি হাঙরের বাচ্চা নয়, হাঙরের খাদ্য। ধরতে পারলে এক নিমেষে ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। কিন্তু এই মাছ (ইংরেজি নাম রিমোরা) এক কৌশল করে হাঙর, বড় কচ্ছপ বা অন্য বড় প্রাণীর দেহের সঙ্গে নিজের শরীর জুড়ে বিনা আয়াসে ঘুরে বেড়ায়। আর খাবার যোগাড় করে নেয়। আবার, ঠিক যেমন ইলেকট্রিক ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে গেলে কিংবা মাথার ওপরকার বৈদ্যুতিক তারে ছোঁয়া লাগলে নির্ঘাৎ মৃত্যু, তেমনি হাঙরের গা থেকে খসে তার মুখের কাছে পড়লে রিমোরারও জীবন সেই মুহূর্তে শেষ।

অমিত বিস্মিত হয়ে বলে—এ যে দেখছি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে চলার মত ব্যাপার। রিমোরার সাহস আর বুদ্ধি বলিহারি। কিন্তু হাঙরের গায়ের সঙ্গে নিজেকে সে আটকায় কী ভাবে? দড়ি দিয়ে?

দড়ি পাবে কোথায়? পেলেও, হাঙরের চলার বেগে কী আর তা থাকত? রিমোরার মাথায় এক রকম বাতাসহীন শোষক আছে যেটা কোন জিনিসের ওপর চেপে ধরলেই শক্তভাবে এঁটে যায়, কিছুতেই খোলে না। অবশ্য রিমোরা ইচ্ছা করলে খুলে নিতে পারে, যেমন অক্টোপাসের বাহুর বাঁধন সে নিজে না খুললে অন্যে খুলতে পারবে না।



অমিত—আমি বরং রিমোরার নাম দেব চুম্বক মাছ। ও তো চুম্বকের মতই অন্য প্রাণীর গায়ে আটকে থাকে।

চিতন—বাঃ! ঠিক নামই দিয়েছ। রিমোরার এই স্বভাবের জন্য মাছ শিকারিরা অনেক সময় তাকে শক্ত সুতোয় বেঁধে জলে ছাড়ে। কোন বড় মাছ বা কচ্ছপের পিঠে সওয়ার হওয়ার সুযোগ পেলেই সে তার অভ্যাস বশে চুম্বকের মত সেঁটে যায়। আর, ব্যস, শিকারিও সুতো টেনে রিমোরার সঙ্গে তার বাহনকে নাগালের মধ্যে এনে ধরে ফেলে।

অমিত—রিমোরা দিয়ে শিকার ধরার কথা শুনে চীনা জেলেদের পোষা-পানকৌড়ি দিয়ে মাছ শিকারের কথা মনে পড়ল। পানকৌড়ির পায়ে সুতো বেঁধে জলে নামিয়ে দিলে জলের মধ্যে ধাওয়া করে মাছ ধরে ভেসে ওঠে। তখন তার মুখ থেকে মাছটি ছাড়িয়ে নিলে সে আবার জলে ডুব দেয়। তবে চুম্বক মাছের মত বড় শিকার সে ধরতে পারে না।

অমিত বুড়োকত্তাকে জিজ্ঞেস করে—কত্তামশাই, অক্টোপাসের গুহায় তার ডিম দেখতে পেয়েছিলাম, এবার হাঙরের বাসায় আমাদের নিয়ে যাবেন না?

বুড়োকত্তা—সব হাঙর কিন্তু ডিম পাড়ে না। আর, যারাও বা পাড়ে তাদের অক্টোপাসের মত সাগর তলায় গুহাঘর নেই। তারা ডিমগুলো জলের মধ্যেই ছেড়ে দেয়, সেখানেই ফুটে বাচ্চা হয়। কতক হাঙর শাবক প্রসব করে। জন্মের পরই এরা নিজেরা খাবার জুটিয়ে নেয়।

অমিত বলে—হাঙর পোষার শখ আমার নেই। কিন্তু একটা চুম্বক মাছ পেলে মাকে দিতাম। তাহলে প্রতিদিন আর বাজার থেকে মাছ কিনতে হত না। ওকে দিয়েই শিকার করিয়ে নেওয়া যেত। মা বলতেন, অমিত একটা কাজের কাজ করেছে।



বাঘ ও রাক্ষসের লড়াই



চুম্বক মাছ নিয়ে যেতে পারলে অমিত কী ভাবে তার মাকে অবাক করে দিতে পারবে সেই আলোচনাই তিনজনে করছিল। এমন সময় চিতন লক্ষ করল, ছোটবড় মাছেরা সব প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে। ব্যাপার কী? অমিত জিজ্ঞেস করে—চাঁদনি রাতে কি মাছেদের দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে?

চিতন হেসে বলে—হ্যাঁ, প্রাণ বাঁচানোর প্রতিযোগিতা। আমাদেরও এখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে। মনে হচ্ছে হাঙরের সঙ্গে অক্টোপাসের লড়াই বেধেছে।

বুড়োকত্তা জিজ্ঞেস করেন—লড়াই বেধেছে ঠিকই। এক পক্ষে হাঙর, কিন্তু অন্য পক্ষে যে অক্টোপাস তা ঠিক দেখেছ তো?

চিতন—ওই দেখুন, গ্রেসার হাঙর লেজের ঝাপটে সাগরজলে ঝড় তুলেছে। একবার

জল থেকে লাফিয়ে উঠল। তখন দেখলাম তাকে জড়িয়ে ধরেছে বিরাট এক অক্টোপাস-রাক্ষস।

অমিত লক্ষ করে বলল—না, অক্টোপাস না, লালরঙের একটা জানোয়ার হাঙরকে ধরেছে। অক্টোপাস তো কালো।

বুড়োকত্তা বলেন— আবার ভালো করে দেখো তো।

অমিত দুই বিশাল দৈত্যের দাপাদাপি ছুটোছুটি ভালো করে লক্ষ করে বলল—তাই তো! এখন দেখছি লাল নয়, ওটার রঙ ফিকে গোলাপি।

বুড়োকত্তা বলেন—ওই তো মায়াবী রাক্ষসের কাজ! অক্টোপাস মাঝে মাঝেই শরীরের রঙ পালটায়। রাত্রিবেলায় সে সাগরতলের গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে, এসেই থ্রেসার হাঙরের মুখোমুখি। কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য।

অমিত বলে—সাগরের বাঘ এবার রাক্ষসের মুখে পড়েছে, ওর নিস্তার নেই।

বুড়োকত্তা বললেন—এটা দানব অক্টোপাস। দেহটা মাত্র ১৮ ইঞ্চি লম্বা কিন্তু প্রতিটি বাহু ১৬ ফুট করে দীর্ঘ। দেখতে পাচ্ছ, হাতির শুঁড়ের মত বাহুগুলি দিয়ে অক্টোপাস হাঙরকে পেঁচিয়ে ধরে পেটে কামড় দিয়ে বিষ ঢেলে দিতে চেষ্টা করছে।

অমিত বলে—বাপরে! অক্টোপাসের তাহলে সাপের মত বিষও আছে?

—হ্যাঁ, কামড়ে ধরতে পারলে মুখের ভিতরকার বিষের থলি থেকে কিছুটা বিষ সে ঢেলে দেয়। এর ফলে শিকার মারা পড়ে না কিন্তু অবশ হয়ে যায়। তখন তাকে ডুবিয়ে নিতে পারলেই রাক্ষসের জয়। ওই দেখ, হাঙর কিছুতেই অক্টোপাসকে তার পেটে কামড় বসাতে দেবে না, সে চাচ্ছে ওকে মুখের কাছে এনে জাঁতিকলে ইঁদুর পড়লে যে অবস্থা হয় সেই দশা করতে।

বহুক্ষণ সাগর তোলপাড় করার পরও দেখা গেল অক্টোপাস হাঙরকে ডুবিয়ে নিতে পারেনি। এর মধ্যে হাঙরের লেজ আর পাখনার ঝাপটে অক্টোপাসের দু'খানা বাহু ছিঁড়ে গেছে। তখন অক্টোপাস হঠাৎ তার বাহুর বাঁধন ছেড়ে হাঙরের মুখে পিচকারি দিয়ে রঙ দেবার ঢঙে ঘন কালির মত রঙ ছিটিয়ে দিল। হাঙর তো হতভম্ব, এ কী হল! কোথায় গেল শত্রু? কালো রঙ জলে মিশে ঘন কুয়াশার মতন পর্দা সৃষ্টি করল। সেই সুযোগে অক্টোপাস রণে ভঙ্গ দিল। বাহু দিয়ে বেগে জল নিক্ষেপ করে সে ছিটকে পিছিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

অমিত দেখল, শুধু হাঙরটাই বোকার মত ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। অক্টোপাসের দেখা নেই। সে তখন কত্তাকে জিজ্ঞেস করল—রাক্ষস কোথায় গেল?

বুড়োকত্তা বলেন—দুইখানা বাহু হারিয়ে রাক্ষস বুঝতে পেরেছে, বাঘের সঙ্গে লড়াই-এ জেতা যাবে না। তাই সে চতুর সৈনিকের মত আড়াল তৈরি করে পালাল।

অমিত—শত্রু পালাতে শুরু করলে বিজয়ী তো তার পিছু ধাওয়া করতে পারত!

—সেইজন্যই অক্টোপাস হাঙরের মুখে-চোখে কালির পিচকারি মেরেছে। আর একই সঙ্গে হাঙরের দিকে মুখ রেখে পিছনে ছিটকে গিয়ে ডুব দিয়েছে তলায়।

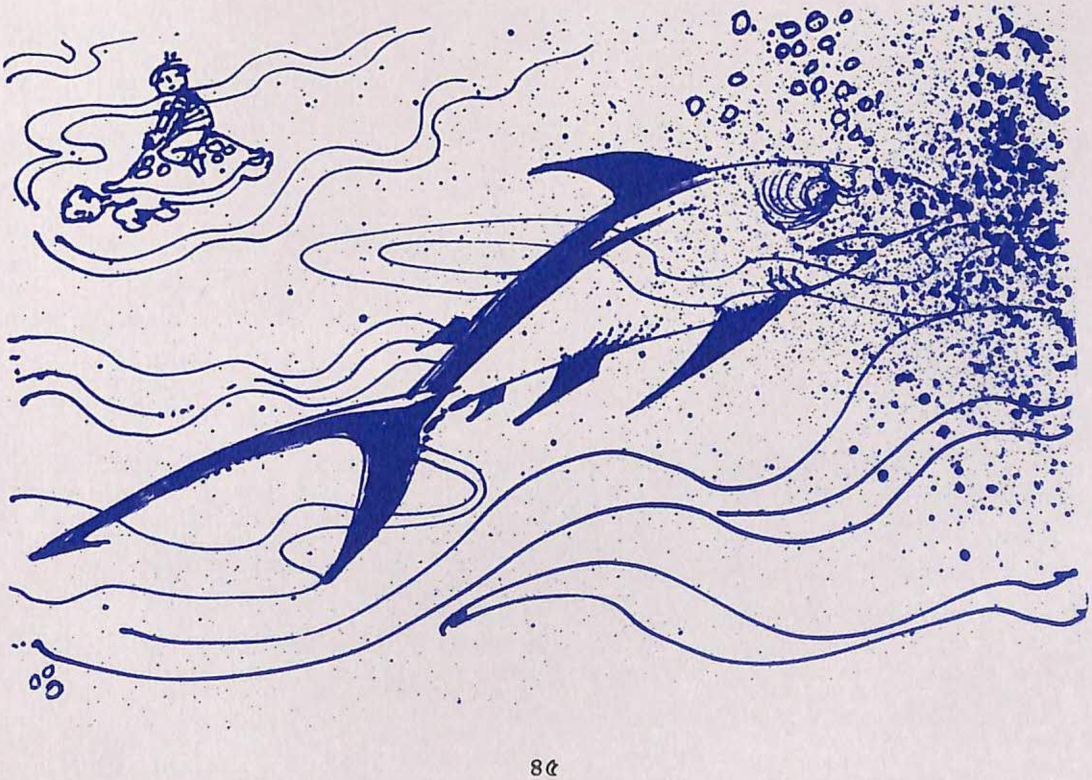
অমিত বলে—পিছন দিকে ছিটকে গেল কী ভাবে, বুঝলাম না।

বুড়োকত্তা বললেন—তুমি তো জেট এরোপ্লেনে ভ্রমণ করেছ। জেট ইঞ্জিন বাতাস টেনে নিয়ে পিছন দিকে প্রচণ্ড জোরে ঠেলে দেয়। তার ফলে প্লেন সামনের দিকে ছুটে চলে। অক্টোপাস তার ফাঁপা বাহুগুলি দিয়ে জল টেনে নিয়ে পিচকারির মত জোরে ছুঁড়ে মারলে সে বিপরীত দিকে বেগে চলে যেতে পারে। বাহুর সাহায্যে সে তার আগে পিছে বা পাশে—যে কোন দিকেই ছুটে চলতে পারে। হাঙরের সঙ্গে লড়াই-এ বিপদ বুঝে পালাবার সময় সে পিছন দিকে ছিটকে পালিয়েছে।

অমিত—অক্টোপাস-রাক্ষস এখন কী করবে?

চিতন হাসতে হাসতে বলে—কী করবে? হাসপাতালে ভর্তি হবে, হাত দু'খানা মেরামত করতে হবে তো!

অমিত ভাবে সত্যিই বুঝি সাগরতলায় হাসপাতাল আছে। এত বড় বিশাল রাজ্য, কত বাসিন্দা।হাসপাতাল তো থাকাই উচিত। বলে—চলো না। একবার হাসপাতাল ঘুরে দেখে আসি।



চিতন বলে—ডুবো পাহাড়ের যে-গুহায় রাক্ষসী বাস করে সেইটিই তার হাসপাতাল। সেখানে ডাক্তার নেই, ওর হাতে ব্যাণ্ডেজ প্লাস্টার কিছুই লাগাতে হবে না। নকল হাতও জুড়ে দিতে হবে না। আহত অক্টোপাস কিছুদিন বাড়িতে চুপচাপ থাকবে। আপনা-আপনি নতুন হাত গজিয়ে উঠবে।

অমিত বলে—সাগররাজ্যের নিয়মকানুন মানুষের রাজ্যের চাইতে ভালো মনে হয়। আমাদের কারো পা কেটে গেলে সেখানে তো কই নতুন পা গজায় না।

চিতন হেসে বলে—তাহলে মানুষের রাজ্য ছেড়ে আমাদের রাজ্যেরই বরং নাগরিক হয়ে যাও। তুমি এখানে ওষুধের কারখানা করতে পারবে।

অমিত—এখানে তো কারো ওষুধই লাগে না। কারখানা দিয়ে কী হবে? আর ওষুধই বা কোথায় মিলবে?

চিতন—সাগরের বাসিন্দাদের জন্য নয়, যোগান দেবে মানুষের দেশে। এখানে লড়াই-এর সময় অক্টোপাস যে-কালো রঙ হাঙরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল ওটি সিপিয়া রস। ছোট ছোট প্রাণীর ওপর ছিটিয়ে দিলে তারা অবশ অসাড় হয়ে পড়ে। অক্টোপাস ছাড়া আরো কয়েক জাতের প্রাণীর এই রকম রঙের থলি আছে। ওই রঙকে বলতে পার রাসায়নিক অস্ত্র, যুদ্ধে যা দুই ধরনের কাজে লাগে। শত্রুকে কাবু করতে আর শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে। ডাঙায় মানুষ-সেনারা শত্রুর চোখে ফাঁকি দিতে যেমন ধুম্রজাল সৃষ্টি করে, তেমনি। সাগরের প্রাণীর সিপিয়া থেকে ওষুধ আর রঙ তৈরি করা হয়েছে। শুধু সিপিয়া কেন, হাঙর ও তিমির দেহ থেকেও ওষুধ আর নানা জিনিস তৈরি করার কৌশল মানুষ শিখে নিয়েছে।

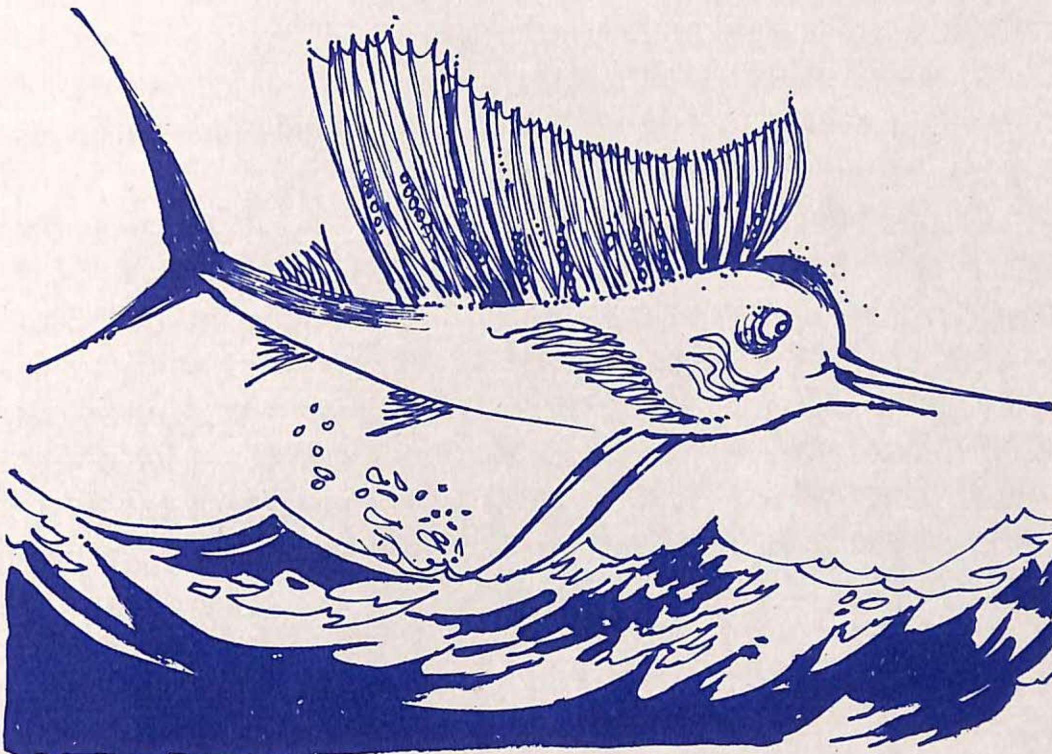
অমিত—শুনেছি, তিমিরা বিরাট জানোয়ার, ডাঙার হাতির মত। ওদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবে?

চিতন—তিমিদের এক গোষ্ঠী কিন্তু আমাদের স্বগোত্র, আকারে বড় আর বংশগরিমায় কুলীন। কিন্তু কতক গোষ্ঠী আছে দারুণ হিংসুটে, আবার কেউ কেউ পেটুকের শিরোমণি। কেবল খায় আর ঘুমোয়।

অমিত—ওদের দেখা পেলে ভালোই হয়। আচ্ছা, অক্টোপাস-রাক্ষসীর মত ওরাও কি সাগরতলায় গুহায় গিয়ে বিশ্রাম করে?

চিতন—কত্তামশাই তোমাকে সব দেখাবেন, বলবেন। ওদের গল্পও শোনাবেন, সব মজার মজার গল্প।

তিমির সঙ্গে দেখা



সেদিন সমুদ্র শান্ত ছিল। নির্মল আকাশ থেকে সোনালি সূর্যের কিরণ সাগর-জলে ছড়িয়ে পড়েছে, নীলে-সোনায় মাখামাখি। অমিতকে নিয়ে বুড়োকত্তা ও চিতন চলেছে তিমির বাড়ির উদ্দেশে। চারিদিকে নীল আকাশ যেন উপুড়করা প্রকাণ্ড একটা বাটির মত সাগরে এসে মিশেছে। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্ল্যানেটরিয়ামে বসে আকাশে নক্ষত্রের উদয়-অস্ত দেখার কথা অমিতের মনে পড়ে। সবখানি আকাশ সেখানে ছিল তার মাথার ওপর। সাগর থেকে এখন মনে হয়, বিরাট এক প্ল্যানেটরিয়ামে যেন সে বসে আছে। তারার বদলে আকাশে সূর্য আর জলের ওপর ওরা তিন জন।

হঠাৎ অমিত দেখল সাগরজলে তাদের কাছাকাছি আরো একজন রয়েছে—একটি পালতোলা নৌকো। নৌকোর মাঝি বা আরোহীদের অবশ্য কাউকে দেখা যায় না। গাঢ় নীলরঙের পালখানি সূর্যের আলোয় ময়ূরের পেখমের মত ঝকঝক করছে।

অমিত বুড়োকত্তাকে বলে—কত্তামশাই, ভালোই হয়েছে। ওই দেখুন একখানা পালতোলা নৌকো, বোধ হয় আমাদের জন্যই রয়েছে। চলুন ওটায় চড়ি, তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।

বুড়োকত্তা হেসে চিতনকে বলেন—চিতন, ওই নৌকোটা পাল তুলে এমনি এমনি ভাসছে, চালু করে দাও, অমিত ওটাতে চড়বে।

চিতন খানিকটা এগিয়ে যেতেই পালতোলা নৌকোটা হঠাৎ জলের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠল। তার সবখানি শরীর জলের ওপরে, কেবল হালখানা জলের মধ্যে। ওই অবস্থাতেই ফরফর করে সে চলে যেতে লাগল।

অমিত তো অবাক! এ কেমন নৌকো, শুধু হালের ওপর ভর করে শূন্য দিয়ে চলে!

বুড়োকত্তা হাসতে হাসতে বলেন—অমিত, দেখলে? তোমার পালতোলা নৌকো জলের মধ্যে ঘুমাচ্ছিল, চিতনের সাড়া পেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ওটি সেইল ফিশ, পালতোলা মাছ। লম্বা প্রায় ২০ ফুট। লক্ষ করো, ওর পিঠের ওপরকার ঝিকঝিকে নীলরঙ আর লম্বা বর্শার মত সরু ওপরের ঠোঁট, নীচের ঠোঁটও সরু কিন্তু ছোট। পালতোলা মাছের অভ্যাস হল শান্ত সাগরে পিঠের পাখনা জাগিয়ে ভেসে ঘুমানো। বেগে চলার সময় লেজটিকে নৌকোর হালের মত চালিয়ে প্রায় খাড়া হয়ে জলের ওপর দিয়ে সে দৌড়োয়। দেখতে ভারি মজার।

অমিত বুড়োকত্তাকে বলে—এই পালতোলা মাছ পুষতে পারলে আমরা অনেক কাজে লাগাতে পারতাম।

চিতন জিজ্ঞেস করে—কী কাজ?

—কেন, গুণ টানার কাজ। স্রোতের উজানে নৌকো চালানোর সময় মাঝিরা নৌকোর সঙ্গে দড়ি বেঁধে নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে নৌকো টেনে নেয়। পালতোলা মাছের গায়ে নৌকোর দড়ি বেঁধে দিলে ও নদীর মাঝখান দিয়েই তা হুড়হুড় করে টেনে নিয়ে চলতে পারবে। মাঝিরা আরাম করে বসে থাকবে।

বুড়োকত্তা শুনে হাসতে হাসতে বলেন—অমিতের পরিকল্পনায় নতুনত্ব আছে। নৌকো চলবে, মাঝিদের পরিশ্রম করতে হবে না। পেট্রোল, কয়লা দিয়ে ইঞ্জিন চালু রাখতেও হবে না। বাঃ। কিন্তু পালতোলা মাছকে ধরতে যাবে কে? অমিত যাবে তো?

—কেন, ধরতে গেলে কী করতে হবে? অমিতের প্রশ্ন।

বুড়োকত্তা—বড়শি ফেলে বা বল্লম দিয়ে বিঁধিয়ে তার সঙ্গে লাগানো দড়ি টেনে ধরার চেষ্টা করতে পার। কিন্তু ওর গায়ে কিছু লাগলেই জল তোলপাড় করে ছুটোছুটি করবে, শূন্যে লাফিয়ে উঠবে, শেষে যে-নৌকো নিয়ে ওকে ধরতে যাবে তা উলটিয়ে ডুবিয়ে দেবে। আর সে-নৌকো যদি কাঠের হয় তবে বর্শার মত ঠোঁট দিয়ে তা এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলবে। এখন ভেবে দেখ, পালতোলা মাছ ধরতে যাবে কিনা।

এই কথা বলে কত্তামশাই হাসতে লাগলেন।

অমিত বলল—থাক, ওরকম বেয়াড়া মাঝিকে দিয়ে নৌকো টানানো যাবে না।

এমন সময় চিতন চেঁচিয়ে উঠল—অমিত, দেখ দেখ, ওই সামনে তাকাও, দেখ তো ও-জিনিসটা চিনতে পার কিনা। সাগরজলে রামধনুর ফোয়ারা।

অমিত বিস্মিত হয়ে দেখে, সত্যিই, জলকণা ফুরফুর করে শূন্যে উঠছে আর তাতে রামধনুর সাতরঙ ঝিলমিল করছে। ব্যাপার কী? ও রকম ফোয়ারা তো কাশ্মীরে মোগল উদ্যানে দেখা যায়। এখানেও কি সাজানো ফুলবাগান আছে?

বুড়োকত্তা বলেন—ওটি ফোয়ারা নয়, তিমির নিঃশ্বাস। তিমির নাকের ফুটো তার মাথার ওপর। একবারে অনেকখানি বাতাস টেনে নিয়ে তিমি ডুবে শিকার ধরে, জলের নীচে থাকতে পারে একটানা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। ডুবে থাকতে থাকতেই সে খাবার গিলে খেতে পারে। তার মাথার ওপরকার নাকের ছিদ্র মাংসপেশি দিয়ে এমনভাবে আটকানো যে তাতে জল ঢোকার কোন উপায় নেই। জলের ওপর ভেসে উঠে অনেক সময়কার বদ্ধ গরম নিঃশ্বাস যখন সে বেগে ছেড়ে দেয়, তখন ওই বাতাস ওপরের দিকে হুসহুস করে ওঠে। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে গরম নিঃশ্বাস কুয়াশার মত ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়, মনে হয় জলের ফোয়ারা। ওই জলকণার ওপর সূর্যের কিরণ পড়ে রামধনুর সৃষ্টি করে।

অমিত বলে—দেওয়ালির রাতে আমরা যে-তুবড়িবাজি পোড়াই তা থেকে আলোর কণা ওই রকম ফুরফুর করে শূন্যে ওঠে, পরক্ষণে নিভে যায়। আমি ভেবেছিলাম আজ বুঝি সাগরকন্যাদেরও দেওয়ালির উৎসব শুরু হয়েছে।

চিতন অমিতকে জিজ্ঞেস করে—দেওয়ালির উৎসবে আর কী হয়?



অমিত—বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনদের খাওয়ানো, উপহার দেওয়া, আলো দিয়ে বাড়ি সাজানো, আতসবাজি পোড়ানো—

চিতন হাসতে হাসতে বলে—বেশ, তিমির বাড়িতে গিয়ে তোমাকে ভরপেট খাওয়ানো হবে—তারপর বুড়োকত্তার কানে কানে কী যেন বলল, অমিত তা শুনতে পেল না।

অমিতের মনে হল চিতন বুড়োকত্তার সঙ্গে কোন গোপন পরামর্শ করছে। তাই সে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? হেসে হেসে ফিসফাস, কোন মতলব আছে বুঝি?

বুড়োকত্তা বলেন—তুমি তো তিমির ফোয়ারা-উৎসব দেখলে। এখন চিতনের ইচ্ছা, তোমাকে তিমির দুধ খাওয়াবে।

তিমির দুধ! শুনে অমিতের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।বলে—আমরা তো জানি ডাঙার প্রাণীরই দুধ হয়। সাগরের জীব তিমিও দুধ দেয়?

বুড়োকত্তা—তিমি আসলে হাতির মত উষ্ণরক্তের প্রাণী। আদিতে ওরা ডাঙাতেই থাকত, জলে বাস করতে শুরু করার পর ওদের দেহের গড়ন গেছে পালটে। গভীর জলে চলতে চারপায়ের দরকার নেই, দরকার সাঁতার কেটে চলার উপযোগী শরীর। তা-ই হয়েছে। পিছনের পায়ের জায়গায় আছে দু'টি বৈঠার মত লেজ, সামনের পায়ের জায়গায় দু'টি পাখনা। আর আকার? রোরকাল বা নীল তিমি লম্বায় ১০০ ফুটেরও বেশি, উঁচু ১০ থেকে ১১ ফুট। প্রাণী জগতে তিমিই সবার চাইতে বড়।

চিতন গর্বভরে বলে—কেমন অমিত, শুনলে তো? সাগরের জীব আমরা ডাঙার জীবের থেকে সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ।

অমিত বলে—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আগে সব শুনি, সব দেখি। তারপর তোমার কথার জবাব দেব। এখন বুড়োকত্তার কাছে তিমির গল্প শুনি।

বুড়োকত্তা—সাগরে তিমিই সর্ববৃহৎ প্রাণী। ডাঙায়ও তিমির মত এত বড় প্রাণী নেই। তিমি অনেক জাতের হয়।এদের কতক ভীরু ধরনের, দারুণ পেটুক। আর কতক ভীষণ হিংস্র। সীলমাছ, সিন্ধুঘোটক ধরে খায়। অক্টোপাস ও তার গোষ্ঠীর কাউকে পেলে ছাড়বে না। এমন কি মানুষকে আক্রমণ করতেও পিছপা নয়। নিরীহরা যে-কায়দায় ছোট ছোট প্রাণী জল থেকে ছেঁকে ধরে তা দেখলে অমিত অবাক হবে।

অমিত জিজ্ঞেস করে—কেমন করে খাবার ধরে? জাল দিয়ে?

—না, চালুনি দিয়ে। তার মুখেই আছে চালুনি। কী রকম চালুনি, শুনবে? রোরকাল তিমির ওপরের চোয়ালে চওড়া দু'টি দাঁত, তার নীচের অংশ চিরুণির মত খাঁজকাটা। নীচের চোয়ালের গড়ন এমন যে, ঠোঁট দু'টি একত্র করলে মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। গলা ও বুকের ওপরকার মাংসপেশি এমনভাবে সাজানো, ছাতা গোটানো থাকলে তার শিকগুলো যেমন ভাঁজ হয়ে কাছাকাছি থাকে, এগুলোও তেমনি গায়েগায়ে লেগে থাকে। প্রকাণ্ড হাঁ করে তিমি যখন মুখের মধ্যে জল নেয় তখন জলের সঙ্গে অসংখ্য ছোট ছোট



প্রাণী মুখে ঢুকে পড়ে, গলার ছাতার মত অংশ ফুলে উঠে জল ধরার জায়গা করে দেয়। তারপর মুখ বন্ধ করে দিলে দাঁতের চিরুণির ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, প্রাণীগুলো মুখের মধ্যে আটকা পড়ে। তিমি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো পেটের মধ্যে চালান করে দেয়।

অমিত বলে—পেলিকান পাখি এমনি করে ঠোঁটের সেঁউতি দিয়ে জল ছেঁকে মাছ ধরে। তার ঠোঁটের নীচে থলি আছে কিন্তু তিমির মত চিরুণী-দাঁত নেই। সব তিমিই কি এমনি ছাকনি দিয়ে খাবার ধরে?

বুড়োকত্তা বলেন—না, হিংস্র তিমিরা সোজাসুজি বড় মাছ ও অন্যান্য প্রাণী ধরে। আর স্পার্ম তিমি হল সবচাইতে ভয়ংকর।

চিতন চারিদিকে লক্ষ রাখছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল—অমিত এদিকে তাকাও। ওই দেখ, নীলতিমি কেমন করে ছাকনি চালায়।

চিতনের দেখানো দিকে তাকিয়ে অমিত দেখে প্রকাণ্ড এক তিমি পাহাড়ের গহ্বরের মত হাঁ করে জলের মধ্যে খানিক ছুটে মুখ বন্ধ করে মাথা উঁচু করে তুলল। নদীবাঁধের ঠেকানো জল গেটের জালিপথ দিয়ে যেমন বেগে বেরিয়ে যায় তেমনি তিমির মুখ থেকে জলের ধারা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। বড় ঢোক গিলে তিমি মুখের মধ্যে জমানো খাবার খেয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল।

অমিত জিজ্ঞেস করে—স্পার্ম তিমির শিকার ধরা দেখতে পাব না?

চিতন উত্তর দেয়—স্পার্মের কাছে ঘেঁষা যাবে না, দূর থেকে দেখতে হবে। ও বাঘের চাইতেও হিংস্র।

তিমি শিকার



অমিত হাঙরের সঙ্গে অক্টোপাসের লড়াই দেখেছে। হাঙর সত্যি বাঘের মত সাহসী আর হিংস্র। হাঙরের থেকেও ভয়ঙ্কর প্রাণী কেমন হতে পারে, অমিত তাই ভাবছিল। চিতন কিছুটা দূরে এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে দ্রুত ছুটে এসে বুড়োকত্তাকে বলল—কত্তামশাই, একটা স্পার্ম তিমি জলের সমান সমানে টান টান হয়ে ঘুমোচ্ছে। এই সময় ওকে ভাল করে দেখা যেতে পারে।

বুড়োকত্তা চিতনকে অনুসরণ করে খানিক দূরে যেতেই সে ইঙ্গিত করল, থামুন।

সাগরে সামান্য ঢেউ, স্বচ্ছ সুনীল জলে তিমির ফ্যাকাশে-শাদা মসৃণ দেহ দেখা যায়। মনে হয়, বিশাল এক শাল গাছ জলে ভাসছে, ছোট ছোট ঢেউ-এর দুলুনি দিয়ে সাগর যেন তার বিরাট শিশুকে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। এ-শিশু যেমন-তেমন নয়, ৬৫ ফুট লম্বা। তার মাথাটাই ২০ ফুটের বেশি। অর্থাৎ সারাদেহের তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে মাথা। মাথা উঁচু ৭ ফুটের ওপর। হাঙরের মাথা যেমন সুচালো, এ তিমির মোটেই তেমন

নয়। স্পার্ম তিমির মাথা দেখে অমিত অবাক। মনে হয়, বিরাট এক কাঠের গুঁড়ি, করাত দিয়ে সমান করে কাটা। মুখ কই? ও বাবা! নীচের দিকে সরু এক ফালি নীচের-ঠোঁট, তাতে দুই সারিতে ৫০/৬০টি গোল সুচালো লম্বা দাঁত। ওপরের পাটিতে দাঁত নেই, সেখানে মাড়িতে আছে শুধু নীচের দাঁত বরাবর ফুটো। মুখ বন্ধ করলে তাই দাঁতগুলো খাঁজে-খাঁজে বসে যায়।

বাগানের মধ্যে হাতি বাঁধা থাকলে ছোট ছেলেরা যেমন চারিদিকে ঘুরে তার বিরাট দেহ দেখে, অমিত তেমনি ঘুমন্ত স্পার্ম তিমির চারিদিক থেকে তাকে দেখছিল। এমন সময় তার নজরে পড়ল দু'টি লম্বা দড়ি জলের মধ্যে সাপের মত এঁকে বেঁকে ঘুরছে। চিতনকে কানে কানে বলল—দেখ তো তিমিকে বাঁধার জন্য কেউ দড়ি ফেলছে কিনা।

চিতন আগে লক্ষ করেনি। দড়ির দিকে চোখ পড়তেই বুড়োকত্তাকে বলল—শীগগির পালান, এখুনি তিমির সঙ্গে স্কুইডের লড়াই শুরু হবে। ওই দেখুন, শুঁড় এগিয়ে আসছে তিমির দিকে।

বুড়োকত্তা অমিতকে নিয়ে সরে যেতে না যেতেই সাগর তোলপাড় করে দুই দৈত্যের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। স্পার্ম তিমি আর স্কুইডের লড়াই। স্কুইডটি ৬০ ফুট লম্বা। তার মুখের চারদিক ঘিরে ছোট ছোট শোষক নল, দু'টো বিরাট অজগরের মত বাহু দেহের তিনগুণ লম্বা, তার মাথায় ধারালো আঁকড়ে আর তাতে অক্টোপাসের মত বেঁধে ফেলার কৌশল। স্কুইডরা ভীষণ হিংস্র, যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে। মাছের ঝাঁক পেলে যত না খাবে তার অনেক বেশি হত্যা করবে। যাকে সামনে পায় কামড়ে তারই মাংস তুলে নেয় আর ঘন ঘন দেহের রঙ বদলায়। কখনো গোলাপি, কখনো লাল, আর পর মুহূর্তেই ফ্যাকাশে-শাদা। শিকার ধরার সময় উত্তেজনায় মাঝে মাঝে জল থেকে লাফিয়ে ওঠে। ওদের একটিরই দ্রুত রঙ পালটানো দেখে মনে হবে যেন দল বেঁধে চলেছে।অক্টোপাসের মত স্কুইডের মুখে রঙের থলি আছে। শত্রুর ওপর রঙ ছিটিয়ে দিয়ে তাকে অবশ করে। দরকার হলে রঙের আড়াল দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। স্পার্ম তিমিটি ভেসে ভেসে ঘুমোচ্ছিল, স্কুইড কখন তার দিকে এগিয়ে এসেছে টের পায়নি। স্কুইডের লম্বা শুঁড়-বাহু তার গায়ে লাগতেই সে নিমেষে জল থেকে লাফিয়ে উঠে স্কুইডের গায়ের ওপর পড়ল। স্কুইডও দু'টি বড় বাহু দিয়ে তিমিকে পুরোপুরি জড়িয়ে ধরে তার গায়ে ছোট শুঁড় দিয়ে কামড়ে মাংস তুলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। তিমি লেজের ঝাপটে স্কুইডকে ছিটকে ফেলে তাকে নিজের মুখের কাছে আনতে চায়। মহাভারতের গজ-কচ্ছপের যুদ্ধের মত এই দুই বীরের যুদ্ধও যেন শেষ হবার নয়। শেষে দেখা গেল, জল কালো হয়ে গেছে।

অমিত জিজ্ঞেস করে—এ কী, সাগর কি কালো হয়ে যাবে?

বুড়োকত্তা বলেন—এবার স্কুইডের শেষ হওয়ার পালা। বাঁচার জন্য ও রঙ ছিটিয়ে তিমিকে বোকা বানাতে চাইছে। কিন্তু স্পার্মের কাছে এতে রক্ষা নেই। ওই দেখ স্কুইডের

মুখ তিমির মুখের মধ্যে। ওই ভয়ঙ্কর দাঁতের পেষণে স্কুইড রসগোল্লার মত তিমির মুখে কুচিকুচি হয়ে যাবে।

প্রাচীন রোমে পশুর সঙ্গে মানুষের মরণ-লড়াই সার্কাসের মত জনপ্রিয় ছিল। মাঝে ফাঁকা জায়গা, চারিদিক-ঘেরা বিরাট গোলাকার সৌধ, তাতে সারি সারি বসার আসন। সেই কলোসিয়াম থেকে লোকেরা ক্ষুধার্ত হিংস্র সিংহের সঙ্গে নিরস্ত্র মানুষের লড়াই দেখত। ফলাফল কী হবে, তাতে কোন সংশয় ছিল না। কেমন করে সিংহ আক্রমণ করে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিড়ে খায়, দর্শকরা বসে বসে তাই দেখত।

তিমির সঙ্গে স্কুইডের লড়াই কতকটা রোমান কলোসিয়ামের হত্যাকাণ্ডের মতই জটিল। বুড়োকত্তার পিঠে বসে অমিত দেখল স্পার্ম তিমির হিংস্র প্রতাপ আর নির্ভীক স্কুইডের বীরের মত মৃত্যুবরণ।

অমিত জিজ্ঞেস করে—কত্তামশাই, এরা দুজনেই সাহসী, শক্তিশালী। এরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরে কেন?

কত্তা হাসেন, বলেন—তুমি ছেলেমানুষ। তুমি কি সব বুঝবে? এই হল জগতের নিয়ম। একজন অপরজনকে খায়; বড় খায় ছোটকে। আবার বড়দের মধ্যেও লড়াই বাধে, কে



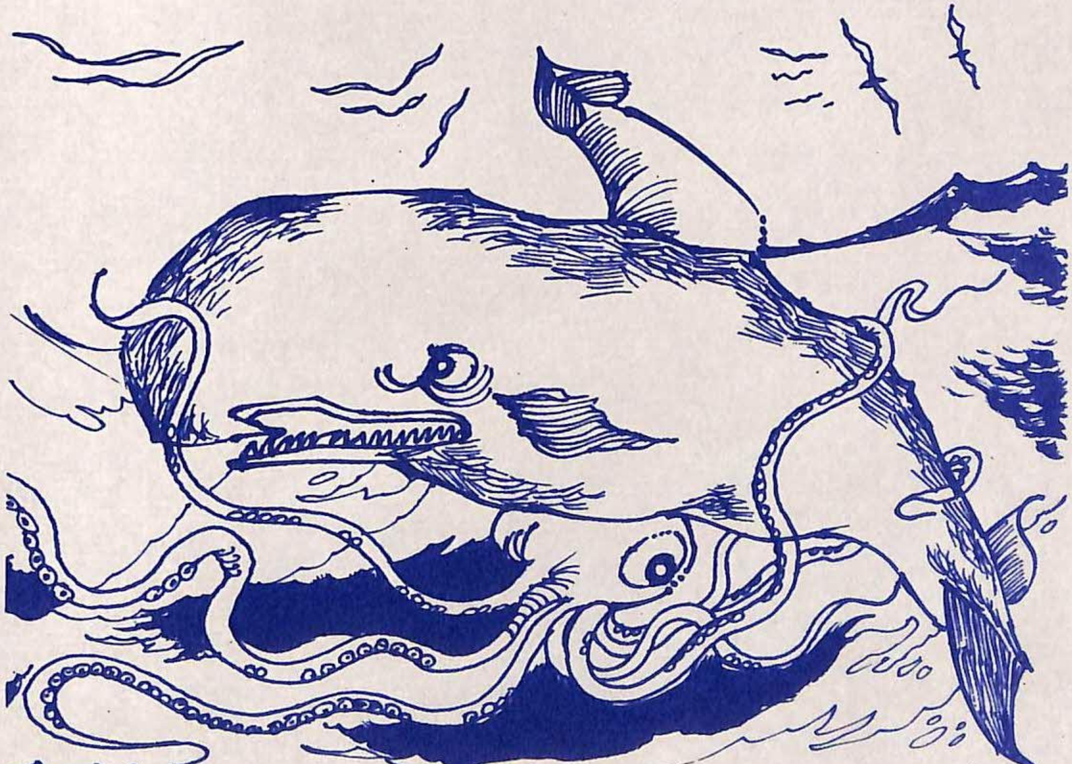
টিকে থাকবে তার জন্য। এই যে স্কুইড দেখলে, এরা ছোটদের যম। তিমিরাও তেমনি। শেষ পর্যন্ত সাগররাজ্য কে দখলে রাখবে তাই নিয়ে বড়র সঙ্গে বড়র সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘাত চিরকাল চলে আসছে এবং চিরকালই চলত যদি মানুষ এসে এই সংঘাতে যোগ না দিত।

অমিত বুড়োকত্তার কথা ঠিকমত বুঝতে পারে না। সে ভাবে তিমি-স্কুইডদের মতো মানুষ সাগরে এসে কেমন করে ওদের সঙ্গে লড়াই করবে? জিজ্ঞেস করে—তিমির তুলনায় এই টুকুন মানুষ কি জলে নেমে সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পারে?

বুড়োকত্তা বলেন—জলে নামলে পারবে না। কিন্তু মানুষের গায়ের জোর কম হলেও বুদ্ধির জোর তো বেশি। তাই সে নৌকোয় চড়ে বল্লম নিয়ে তিমি শিকার করতে আসে। ডাঙার শিকারি যেমন হাতির পিঠে চড়ে বন্দুক নিয়ে বাঘ শিকার করে, তেমনি। অনেক সময় এই সব সাহসী মানুষকে তিমির মুখে বিপদে পড়তেও দেখেছি।

অমিত শিকারের কাহিনী শোনার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে, বলে—কত্তামশাই, মানুষের সঙ্গে তিমির লড়াই-এর গল্প বলুন না, যা আপনি নিজে দেখেছেন।

বুড়োকত্তা বলতে শুরু করেন—অনেক কাল আগের কথা। তখনও মানুষ লোহা দিয়ে



নৌকো তৈরি করতে শেখেনি। ভট-ভট শব্দ করা ইঞ্জিনও বানায়নি। সাগরের মধ্যে দ্বীপে যারা বাস করত তারা তিমি শিকারের জন্য ছোট নৌকোয় চার-পাঁচজনে দড়ি আর বল্লম নিয়ে মাঝ-দরিয়ায় চলে যেত।

তখন আমার বয়স কম। সব কিছু দেখার ভারি শখ। একদিন দেখি নৌকো নিয়ে শিকারিরা চলেছে। কৌতূহলবশে আমিও তাদের পিছুপিছু চললাম। অনেক দূর যাওয়ার পর দেখা গেল সাগরজলে ফোয়ারা উঠছে, তিমির নিঃশ্বাস। অতি সাবধানে নৌকোখানা তিমির কাছাকাছি নিয়ে যেতেই একজন লোক—তার গায়ে কী ভীষণ জোর, খালি গা, মনে হয় পাথর কুঁদে শরীর গড়া হয়েছে, হাতের মাংসপেশিতে রোদ পড়ে চকচক করছে—বল্লম ছুঁড়ে মারল তিমির ওপর। বড়শির মত উলটো আঁকড়ে লাগানো সেই বল্লম। তার সঙ্গে শক্ত দড়ি বাঁধা। দেখা গেল, বল্লমের শেষ ভাগটা জলের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমনি শিকারিদের চিৎকার—বিঁধেছে, বিঁধেছে! একবার দেখলাম জলের ওপর রক্তের ফোয়ারা উঠল। পরমুহূর্তে শুরু হল জীবন-মরণ খেলা।

অধীর আগ্রহে অমিত জিজ্ঞাসা করে—তারপর?

—তারপর আহত তিমি পিঠে-বেঁধা বল্লম নিয়ে জল তোলপাড় করে ছুটে চলল। বল্লমের সঙ্গে বাঁধা দড়ির এক প্রান্ত শিকারিদের হাতে। তারা প্রথম দিকে দড়ি ঢিলে দিয়ে তিমিকে ছুটে চলার সুযোগ দিল। পরে দড়ি টেনে ধরল। কিন্তু তিমি তাতেই থামল না, নৌকো টেনে নিয়ে চলল ভীষণ বেগে। একদিক থেকে ফিরে তিমি অন্য দিকে চলতে থাকে, নৌকোও চলে তার টানে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। শিকারিরা কেউই তেমনটি আশঙ্কা করে নি।

উত্তেজনায় অমিতের শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে, তারপর কী হল?

—আহত তিমি জখম হওয়া বাঘের মত নৌকোর দিকে মুখ করে ফিরে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, তারপরেই প্রচণ্ড বেগে জলের মধ্যে ঝড় তুলে নৌকোর কাছে ছুটে এল, এসেই লেজের এক ঝাপট। ব্যাস! কাঠের নৌকোর তক্তাগুলো দেশলাই-এর কাঠির মত এদিক-ওদিক ছিটকে উঠে জলে ছড়িয়ে পড়ল।

অমিত শিউরে ওঠে, জিজ্ঞেস করে—আর সেই শিকারিরা?

বুড়োকত্তা খানিক চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন—নৌকোর তক্তাগুলো ভাসতে দেখা গেল কিন্তু শিকারিদের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। খানিক পরে দেখি তিমি একদিকে চলে যাচ্ছে, তার পিঠে-বেঁধা বল্লমের শেষ প্রান্তটা জলের ওপর জেগে আছে, তাতে বাঁধা রয়েছে দড়ি। বিরাট সাপের মত লম্বা দড়িটা জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে তিমির সঙ্গে সঙ্গে।

অমিত জিজ্ঞেস করে—সব শিকারিই তো মারা পড়ল। তারপরেও কি অন্যরা তিমি মারতে যেত?

বুড়োকত্তা—হ্যাঁ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিকারিরা জিতত। তিমিকে কাবু করে নৌকোর সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে আসত বাড়িতে। তবে নতুন কায়দায় শিকার করার কৌশল জানার পর মানুষের সঙ্গে তিমিরা আর পেরে উঠছে না।

অমিতের জিজ্ঞাসা—নতুন কায়দাটা কেমন? আপনি দেখেছেন? সেই রকম শিকারের একটা গল্প বলবেন?

বুড়োকত্তা বলেন—আমার বাল্যকালে, কিশোর অবস্থায় আর যৌবনে আমি কেবল কাঠের নৌকোই দেখতাম। পাল তুলে নৌকো চলত, বেশ লাগত, মনে হত নৌকোগুলি যেন সাগরের পাখি। তারপর দেখলাম বড় বড় চোঙওয়ালা লোহার নৌকো, চোঙ দিয়ে কালো ধোঁয়া ওঠে রাশি রাশি, দুই পাশে বিরাট আকারের চাকা ঘোরে, জল ছিটিয়ে চলে। ওই ধোঁয়া কী করে চাকা ঘোরায় তা আমার জানা নেই। আরো কিছুকাল পরে দেখি বিশাল আকারের লোহার নৌকো, সুন্দর রঙকরা, কিন্তু তাতে চাকা দেখা যায় না। পিছনে তুফান তুলে নৌকোগুলো ছুটে চলে।

একদিন কাছে থেকে এই রকম একটা ছোট নৌকোকে নতুন কায়দায় তিমি শিকার করতে দেখলাম।



অমিত—হ্যাঁ, কেমন করে, তাই শুনতে চাই।

বুড়োকত্তা—সেদিন দুপুরবেলা। আকাশে মেঘ ছিল না, সাগরে মাঝারি গোছের ঢেউ। আমি ঢেউ-এর সঙ্গে দুলছি, মাঝে মাঝে রোদ পিঠে এসে পড়ছে। হঠাৎ দেখি খানিকটা দূরে একখানা শাদারঙ করা লোহার নৌকো ভীষণ বেগে ছুটে চলেছে, নৌকোর সামনের দিকে একটা কামান বসানো। বাইনোকুলার চোখে একজন কী যেন খোঁজ করছে। খানিক পরেই কানফাটানো এক আওয়াজ। চেয়ে দেখি সেই কামানের সঙ্গে লাগানো একটা লম্বা দড়ি, আর দড়ির মাথায় যে খাটোমত বল্লম সেটা তিমির গায়ে গিয়ে বিঁধেছে। এর পর আরো একটা আওয়াজ, সেটা ছোট, ওই বল্লম থেকেই। বল্লম-গোলার মধ্যে যে-বিস্ফোরক ছিল, তিমির গায়ে বেঁধার পর তা ফেটে তিমিকে আরো ঘায়েল করে তুলল।

অমিত জিজ্ঞেস করে—তিমি এবারে তাহলে শিকারির বোট ডোবাতে পারল না।

বুড়োকত্তা—এবার তো আর কাঠের নৌকো নয়, লোহার জাহাজ। তিমির চাইতে অনেক বেশি জোরে ছুটতে পারে। তবু দেখলাম আহত তিমি জাহাজটাকে টেনে নিয়ে গেল মাইলখানেক। শেষে কাহিল হয়ে পড়লে তিমিকে জলে ভাসিয়ে জাহাজের পিছন দিকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বিরাট খোলের মধ্যে তিমিটাকে ঢুকিয়ে শিকারিরা চলে গেল।

মানুষ শখ করে বড়শি বা বল্লম দিয়ে মাছ শিকার করে থাকে সেটা তবু বোঝা যায়। কিন্তু জাহাজ নিয়ে দূর সাগরে ঘুরে ঘুরে তিমি ধরে কী লাভ তা অমিত বুঝতে পারে না।

সে জিজ্ঞেস করে—কত্তামশাই, একটা তিমি তো প্রায় দশটা হাতির সমান। লোকেরা কি তিমি ধরে বিরাট আকারের ভোজ লাগায়?

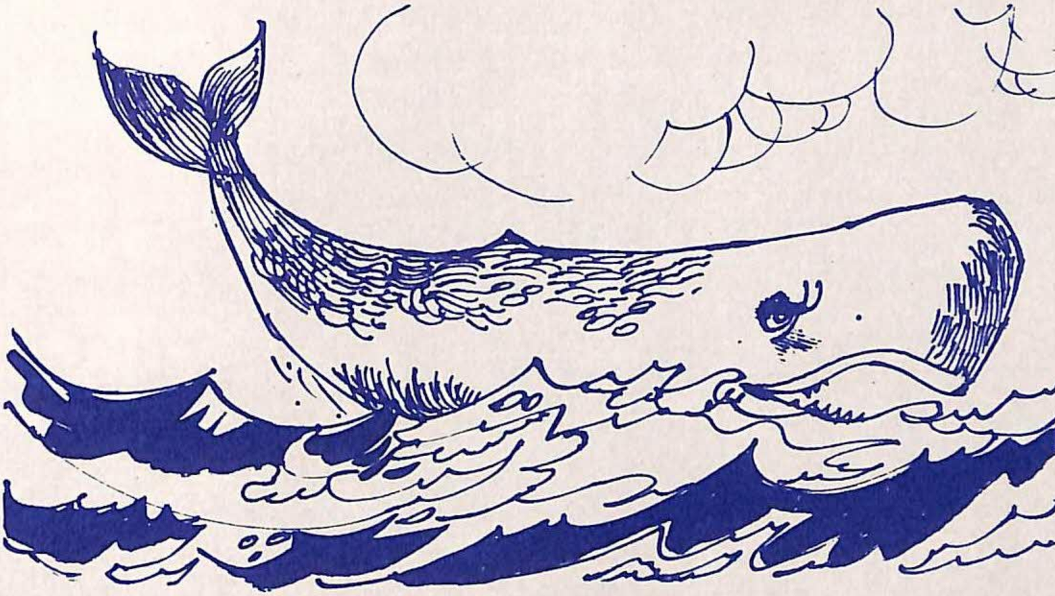
বুড়োকত্তা বলেন—না, না। অত মাংস আর চর্বি শিকারিরা খাবে কী করে? তিমির চর্বি, মাংস, হাড়গোড় মানুষের নানান কাজে লাগে। তাই শত শত তিমি শিকার করে কারখানায় নিয়ে হাজির করা হয়। সেখানে তিমির চামড়া খুলে ফেলে চর্বি মাংস আলাদা করা হয়। চর্বি থেকে হয় পিপে পিপে তেল, যা কারখানায় ব্যবহার করা হয়, সাবান তৈরিতে বা মোমবাতি তৈরিতে লাগে।

অমিত জিজ্ঞেস করে—মানুষ এই চর্বি খায় না?

—ইউরোপ ও আমেরিকায় রান্নার তেল হিসাবে তিমির চর্বির ব্যবহার হয় শুনেছি। তিমির মাংস আর তিমির লিভার অয়েল মানুষেরও খাদ্য।

অমিত বলে—লিভার অয়েল শুনে মনে পড়ল কড লিভার অয়েলের কথা। মা আমাকে খেতে দিতেন, কী বিদঘুটে গন্ধ, কিন্তু বলতেন খেলে গায়ে জোর হয়। আচ্ছা, সবচেয়ে বেশি তিমি ধরা পড়ে কোথায়?

বুড়োকত্তা—মেরু অঞ্চলের শীতল জলে তিমির সংখ্যা বেশি, বিশেষ করে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে। সেখানে তিমি ধরে চর্বি বের করে নেওয়ার জন্য কারখানা-ধরনের বড় জাহাজ নিয়ে যাওয়া হয়। আর এক-একটা কারখানা-জাহাজের সঙ্গে থাকে ছোট ছোট দ্রুতগামী



তিমি-ধরা জাহাজ। তিমির সন্ধান করার জন্য আজকাল হেলিকপটার ব্যবহার করা হয়। হেলিকপটারে সাগরের ওপর ঘুরে ঘুরে তিমি দেখতে পেলে শিকারি-জাহাজকে তা বেতারে জানানো হয়। শিকারিরা তখন ছুটে আসে নির্দিষ্ট জায়গায় হারপুন-কামান নিয়ে। শুধু তাই নয়। জলের মধ্যে এক রকম যন্ত্র নামিয়ে এমন শব্দ তরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে তিমিরা ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করে এবং তার ফলে হয়রান হয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে জলের ওপরে ভেসে ওঠে। তিমির নিঃশ্বাস মানেই জলকণার ফোয়ারা, সহজেই মানুষের চোখে পড়ে।

অমিত বলে—ছোট শিকারি-জাহাজ কি তিমিদের জাহাজের মধ্যে তুলে নিতে পারে?

—কী করে পারবে? প্রায়ই তিমিগুলো জাহাজের চাইতে বড় হয়। শিকারিরা তিমিগুলোকে জলে ভাসিয়ে ওদের গায়ে নিশান পুঁতে কারখানা-জাহাজকে খবর পাঠায়। তারপর আরো শিকারের সন্ধানে চলে যায়। কারখানা-জাহাজ এসে নিশান দেখে জাহাজের খোলে শিকার তুলে নেয়।

অমিত—তিমির গায়ে নিশান আবার কেমন? বুঝলাম না।

বুড়োকত্তা বলেন—মরার পর তিমি যাতে ডুবে না যায় তাই তার ফুসফুসে বাতাস ঢুকিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে রাখা হয়। কিন্তু ভেসে থাকলেই তো হবে না। বাতাসে, স্রোতে এদিক ওদিক চলে যেতে পারে। দূর থেকেও যাতে নজরে পড়ে সেইজন্য একটা নিশান তিমির পিঠে পুঁতে রাখা হয়। রাত্রি হয়ে গেলে বা কুয়াশা থাকলে নিশান চোখে না পড়ার সম্ভাবনা। ঝড়বাতাসে নিশানের খুঁটিও ভেঙে যেতে পারে। সেজন্য ভাসমান তিমির সঙ্গে আলোর

বয়া লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। আজকাল আরো উন্নত উপায় খাটানো হয়। দেহের সঙ্গে এমন এক ইলেকট্রনিক যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয় যা সংকেত পাঠিয়ে জাহাজের লোকেদের জানিয়ে দেয় ওটি কোথায় রয়েছে।

এই সময় অমিতদের মাথার ওপর দিয়ে একটি হেলিকপটার উড়ে গেল। দূরে একটি জাহাজ নজরে পড়ল। চিতন বলে—কত্তামশাই, ওরা কি আমাদের দেখতে পেয়েছে? না কি আমাদের ওপরই হারপুন-কামান ছুঁড়বে?

কত্তামশাই চারিদিকে ভালো করে দেখে বললেন—এখন বুঝতে পেরেছি।ওই পিছন দিকে চেয়ে দেখ।

সবাই পিছন দিকে তাকাল। অমিত বলে—চিতন, ওই দেখ, একটা দ্বীপের ওপর শাদা একখানা নিশান উড়ছে। জাহাজ বোধ হয় ওই দ্বীপের কাছে আসছে।

অমিতের কথা শুনে বুড়োকত্তা হেসে বলেন—ওই দ্বীপে অমিতকে নামিয়ে দিলে হয়। খানিক পরে দ্বীপটি দিব্যি জাহাজের পাটাতনের ওপর গিয়ে উঠবে।

অমিত জিজ্ঞেস করে—তার মানে?

বুড়োকত্তা বলেন—তুমি যেটাকে দ্বীপ বলছ, সেটা আসলে একটা তিমি। শিকারিরা ওটি মেরে ওর ফুসফুসের মধ্যে বাতাস চালিয়ে তোমরা যেমন বল পাম্প করে ফুলিয়ে তোল তেমনি ফুলিয়ে দিয়েছে। দেখ না, তিমিটা জলের ওপরে কেমন উঁচু হয়ে ভেসে রয়েছে। আর ওই নিশান দেখে কারখানা-জাহাজ ওটিকে তুলতে আসছে।

অমিত বলে—ভালোই হল। তিমিটাকে নিয়ে এবারে কী করে দেখতে পাব।

খানিক বাদে জাহাজখানা এসে মৃত তিমিটার পাশে দাঁড়াল। জাহাজ থেকে দুইজন লোক নামল তিমির পিঠের ওপর। তারপর শিকল বেঁধে ক্রেন লাগিয়ে বিশাল দেহটাকে জাহাজের ওপর তুলে নিল।

এটি স্পার্ম তিমি। ৬৫ ফুট লম্বা। বিরাট মাথা, উঁচু ৭ ফুট, লম্বা ২১ ফুট। মনে হয় বিরাট এক সেগুন গাছ। কাঠের কারখানায় বিদ্যুৎ-চালিত কলের করাত দিয়ে যেমন কাঠ চিরে তক্তা বের করা হয়, তেমনি তিমির মাথার খুলিটা তক্তার মত তুলে ফেলা হল। তারপর কয়েক জন লোক মাথার পাশে মই নিয়ে দাঁড়াল, তাদের হাতে বড় প্লাস্টিক বালতি।

অমিত জিজ্ঞেস করে—বালতিতে জল নিয়ে কি তিমির মাথাটি ধুয়ে দেবে?

বুড়োকত্তা বলেন—স্পার্ম তিমির মাথায় থাকে তরল তেল। ওই তেলটা মূল্যবান। চামড়া ছাড়ানোর আগে মাথার তেল সংগ্রহ করে নেবে।

অমিত বলে—কত তেল? বালতি লাগবে?

বুড়োকত্তা উত্তর দেন—কম নয়, অন্তত ১৫ পিপে তেল। প্রতি পিপেয় যদি ২০০ লিটার তেল ধরে তবে একটা স্পার্মের মাথা থেকে পাওয়া যাবে ৩ হাজার লিটার।

অমিত জিজ্ঞেস করে—এ তেলে কী হয়?

বুড়োকত্তার উত্তর—বাতাস লাগলে এ তেল জমাট বেধে যায়। স্পার্মের মাথার তেল দিয়েও আগের দিনে ভালো মোমবাতি তৈরি হত। এখন মেশিন মসৃণ ও সচল রাখার জন্য দামি, সূক্ষ্ম কলকব্জায় এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

তেল তোলা হয়ে গেলে কয়েকজন লোক স্পার্মের মাথায় হাত দিয়ে কী যেন দেখাচ্ছিল। চিতন বুড়োকত্তাকে জিজ্ঞেস করল—মৃত তিমির মাথায় হাত বুলিয়ে কি আদর করা হচ্ছে?

বুড়োকত্তা বলেন—না, ওরা তিমির তারিফ করছে। স্কুইড, অক্টোপাস ও অন্য তিমিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ওর মাথায় যে-জখম হয়েছিল লোকেরা তাতে হাত বুলিয়ে নিজেরা বলাকওয়া করছে। বলছে, এ তিমি ভীরু ছিল না, ছিল রীতিমত সাহসী যোদ্ধা। অনেক যুদ্ধেই সে জয়লাভ করেছিল। শুধু হেরে গিয়েছে নতুন যুগের অস্ত্রের কাছে। তাই ওকে ওরা বীরের সম্মান দিচ্ছে।

জাহাজের লোকেরা বড়, ধারালো ছোরার মত অস্ত্রদিয়ে তিমির পিঠ চিরতে শুরু করলে বুড়োকত্তা বললেন—এবার চামড়া খুলে ফেলে চর্বি-স্তর তুলে নেবে। পেটের ভিতর পাবে অ্যামবারগ্রিস। ওটা বেশ দামি জিনিস।

অমিত জিজ্ঞেস করে—অ্যামবারগ্রিস কী? কেমন দেখতে?

বুড়োকত্তা বলেন—নরম হালকা পদার্থ। তুমিও হয়ত ব্যবহার করেছ।

অমিত বলে—কই, না তো?



বুড়োকত্তা হেসে বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। দামি সেন্ট গায়ে লাগাওনি? অ্যামবারগ্রিস দিয়ে সুগন্ধটা দীর্ঘস্থায়ী করা হয়। তাছাড়া ওটা থেকে ওষুধও তৈরি হয়। ওটা শুধু স্পার্ম তিমির পেটেই পাওয়া যায়। আমি একবার সাগরে অ্যামবারগ্রিস ভাসতে দেখেছিলাম। মনে হয় তিমিটা মরে গেলেও ওই জিনিসটা নষ্ট হয়নি, বড় কর্কের মত ঢেউ-এর দোলায় দুলছিল।

চিতন স্পার্মের মাথা কেটে তেল বের করা দেখার পর থেকে মনে কষ্ট পাচ্ছিল। সে এখন বলল—কত্তামশাই, তিমি আমাদের স্বগোত্র। আপনজনের এ অবস্থা দেখতে আমার ভালো লাগছে না। চলুন, অন্য দিকে যাই।

অমিত বলে—তাই ভালো, চলুন।

কিছু দূর চলার পর সাগরজলে ফোয়ারা দেখে অমিত চেঁচিয়ে উঠল—ওই দেখুন। তিমি ফোয়ারা-নিঃশ্বাস ফেলছে। চলুন না একবার কাছে গিয়ে ভালো করে দেখি।

খানিক গিয়ে কত্তামশাই বললেন—ভালোই হয়েছে। এটি মা-তিমি, সঙ্গে দেখছি বাচ্চা রয়েছে।

কই দেখি দেখি, বলে অমিত উঠে দাঁড়াল। কত্তা বললেন—বাচ্চা হলেও তোমার মত ছোট্টটি নয়। ওই দেখ, ওর মায়ের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে যাচ্ছে। লম্বা ২৪ ফুট, মনে হয় আজই হয়েছে।

চিতন খুশি হয়ে বলে—কত্তামশাই, অমিতকে তিমির দুধ খাওয়াবেন না? ওর খিদেও লেগেছে।

কত্তা বলেন—অত দুধ অমিত খেতে পারবে না, এক চুমুক দিলেই ওর পেট ফুলে যাবে।

অমিত জিজ্ঞেস করে—কতখানি দুধ হয়?

কত্তা উত্তর দেন—দশ-বারো মণ তো হবেই।

অমিত বিস্মিত হয়ে বলে—ওরে ব্বাবা, এত?

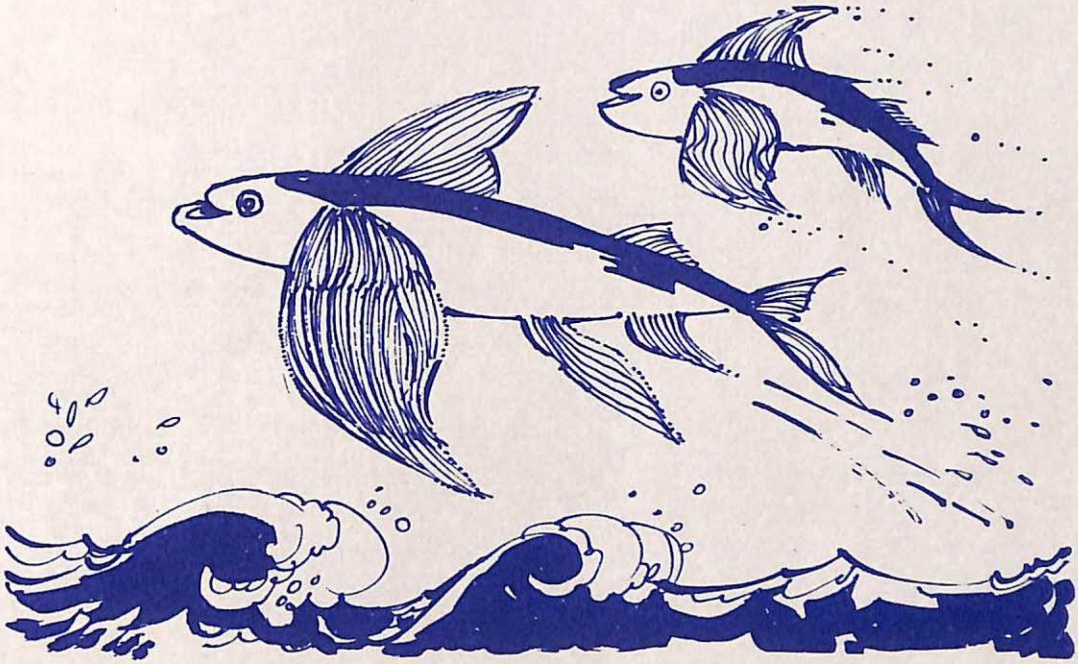
বুড়োকত্তা চিতনকে বলেন—তুমি বরং যাও, তিমির পেটের নীচে গিয়ে মুখ লাগালেই দুধ পাবে। কিছুটা নিয়ে এস, অমিতের হবে, তোমারও হবে।

চিতন হেসে বলে—তিমির পেটে মুখ লাগাবো? আমাকে ও পেটের মধ্যে পুরে ফেলবে না তো?

কত্তা বলেন—ভয় নেই, ও ভাববে বাচ্চাই মুখ লাগিয়েছে। সন্তানের ওপর তিমির খুব মায়া।

চিতন তিমির দুধ এনে অমিতকে দিলে অমিত খেয়ে বলে—বাঃ! বেশ মিষ্টি স্বাদ।

মাছপাখি



বুড়োকত্তা, অমিত ও চিতন সাগরে ভেসে চলেছে। নীল ঢেউ-এর মাথায় শাদা ফেনা। অমিত হাতে সেই ফেনা ধরে। কিন্তু রাখতে পারে না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যায়।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল কতকগুলি পাখি ঝাঁক ধরে উড়ছে। জলের কাছাকাছি দিয়ে ওড়ে। ও কী, একটা যে জলে পড়ে গেল। অমিত চিতনকে বলে—ভাই চিতন, তুমি তো জোরে ছুটতে পার, যে পাখিটা জলে পড়েছে এনে দাও, বাড়ি নিয়ে পুষব।

বুড়োকত্তা বলেন—সাবধান চিতন, ওদিকে এগিয়ো না, বর্শার ঘায়ে প্রাণ যাবে।

অমিতের কাছে বুড়োকত্তার কথা হেঁয়ালির মত ঠেকে। সে জিজ্ঞেস করে—সাগরের পাখিদের কি বর্শা থাকে?

বুড়োকত্তা বলেন—তুমি চিনতে পারোনি। ওগুলো পাখি না, উড়ুক্কু মাছ। করাত আর বল্লম নিয়ে শত্রু তাড়া করেছে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওরা শূন্যে উড়ে উঠেছে। ওদের সত্যিকারের পালকওয়ালা ডানা নেই, সামনের পাখনা দু'খানা বড়, তাই শূন্যেও বাতাস কেটে খানিক চলতে পারে।

বুড়োকত্তা— মাছদের এই এক বড় শত্রু! গায়ে প্রচণ্ড জোর। সাহস দুর্দান্ত। মাছ তো কথাই নেই, তিমিকেও আক্রমণ করে। এমন কি আমি একবার এক বড় কাঠের জাহাজকেও আক্রমণ করতে দেখেছিলাম।

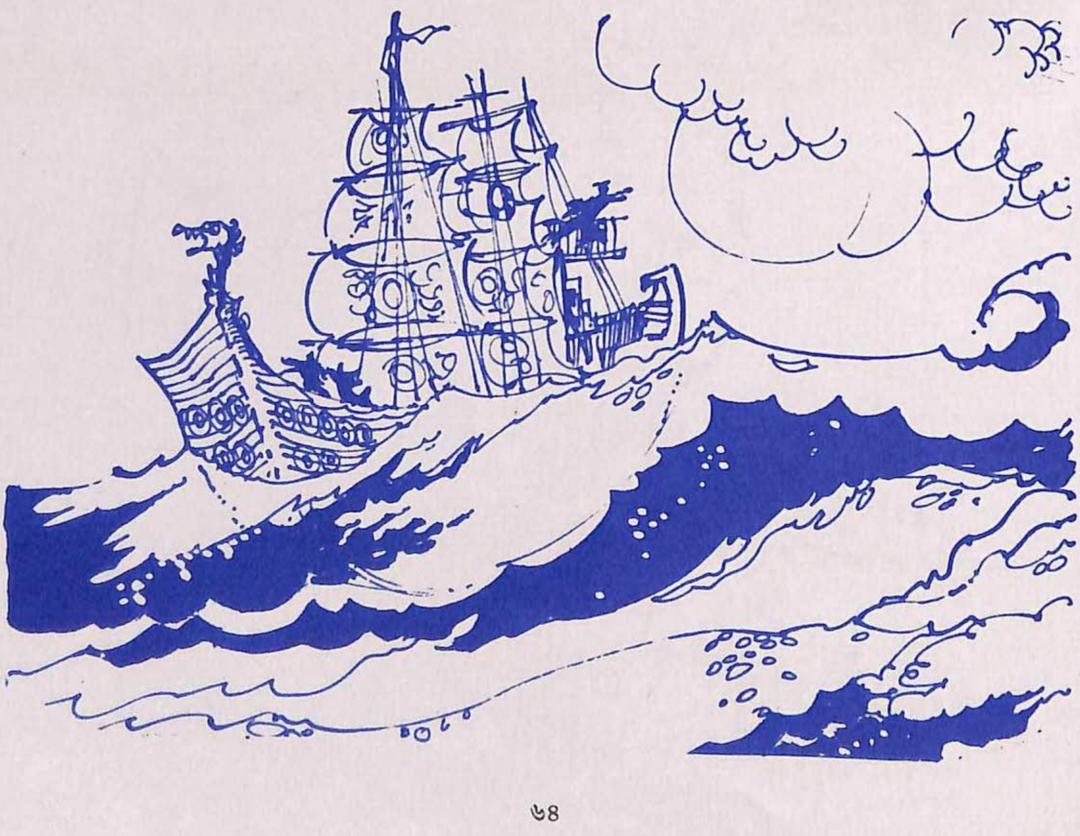
চিতন ভয় পেয়ে বুড়োকত্তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, বলল—ওইখানে বল্লমের আগা দেখলাম যেন।

বলতে বলতে শূন্যে লাফিয়ে উঠল কালো দৈত্যের মত বল্লমধারী এক প্রাণী, সোর্ড ফিশ।২০ ফুট লম্বা, মাথা ও পিঠের ওপর দিকটা কুচকুচে কালো। ভারি মাথার ওপর ঝুঁটির মত মস্তবড় পাখনা। ওপরের ঠোঁটটি লম্বা ধারালো তলোয়ারের মত। প্রাণীটিকে দেখে মনে হয়, এক-শিঙা বদরাগী গণ্ডার। বেগে ছুটে এসে যাকে সামনে পায় তাকেই তলোয়ারে বিঁধে ফেলে। এর মুখের কাছে পড়লে মাছেদের রক্ষা নেই।

অমিত জিজ্ঞেস করে—আর করাত নিয়ে আসে কে? করাত দিয়ে কি কাঠ চেরে?

বুড়োকত্তা—করাত মাছ তলোয়ার মাছের মতই সাগরের দৈত্য। আকারে তলোয়ারধারীদের থেকে কিছু বড় হবে। ওপরের ঠোঁটটি বল্লম নয়, দু'দিকে ধারওয়ালা করাতের মত। মানুষকে সামনে পেলে কেটে দুই খণ্ড করে ফেলবে, করাতে এমনই জোর!

অমিত গল্প শুনতে ভালোবাসে। করাত মাছ বা স্য ফিশের কথা শুনে সে বুড়োকত্তাকে



বলে—কত্তামশাই, আপনি বললেন জাহাজকে আক্রমণ করতে দেখেছিলেন। সেই গল্পটা বলুন না।

কত্তামশাই—সে অনেককাল আগের কথা। তখনকার দিনে সাগরে কেবল কাঠের পালতোলা জাহাজই দেখা যেত। ভারতবর্ষের লোকেরাও জাহাজ নিয়ে সুমাত্রা, বালী, যবদ্বীপে বাণিজ্য করতে আসত। একবার যবদ্বীপের কাছে একটা নির্জন দ্বীপে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি। একদিন দেখি একখানা প্রকাণ্ড কাঠের জাহাজ, তাতে দু'টি মোটা মাস্তুলে তিনখানা বিরাট পাল তোলা। পর্তুগীজদের জাহাজ। ওরা মসলা কেনার জন্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসত। জোর বাতাস। জাহাজ বেশ বেগে ছুটেছে, জাহাজের সামনের দিকে ঢেউ চিরে দুই ভাগ হয়ে জাহাজের গা বেয়ে পিছন দিকে চলে যাচ্ছে। দেখে আমার ভারি ভালো লাগছিল। কী মনে হচ্ছিল, জানো? মনে হচ্ছিল কাঠের জাহাজখানা যেন এক বিরাট চিরুনি। সাগরের নীল চুল আঁচড়িয়ে দুই ভাগ করে দিচ্ছে, পিছনে চলে যাচ্ছে যে ঢেউগুলি সেগুলি যেন সাগরের কোঁকড়ানো লম্বা চুল।

চিতন টিপ্পনি কেটে বলে—কত্তামশাই-এর তখন কম বয়স তো, মনে বেশ কবিত্ব ছিল।

কত্তামশাই চিতনের কথায় কান দিলেন না। বলেই চললেন—ওই সময় দেখি বেশ কয়জন নাবিক জাহাজের এক পাশে কৌতূহল নিয়ে কী যেন লক্ষ করছে। আমি চেয়ে দেখি দু'টি সাগরদৈত্য—একটি তলোয়ার মাছ অন্যটি করাত মাছ।



অমিত জিজ্ঞেস করে—তারপর? তারপর কী হলো? তার কণ্ঠে উদ্বেগের আভাস।

বুড়োকত্তা বলেন—দৈত্য দু'টি ভেবেছে জাহাজখানি বুঝি তিমি, লড়াই করতে এসেছে। ওদিকে নাবিকরা সাগরদৈত্যদের দেখতে পেয়েছে। তারাও ভাবছে, কী জানি কী বিপদ হয়! এমন সময় তলোয়ার মাছ বেগে ছুটে গিয়ে জাহাজের পেটের মধ্যে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল। পুরু তক্তা ভেদ করে দৈত্যের তলোয়ার চলে গেল জাহাজের ভিতরে। তিমি বা অন্য মাছের পেটের মধ্যে তলোয়ার চালিয়ে আবার তা বের করে আনা যেত কিন্তু জাহাজ থেকে তা করা গেল না। দৈত্য জাহাজের গায়ে আটকা পড়েছে দেখে নাবিকরা উল্লাস ধ্বনি করে উঠল। সারেঙ কিন্তু ভয় পেয়ে গেছেন। বললেন—শীগগির নীচে যাও, তলোয়ার খুলে দাও আর না হয় কেটে ফেল। ফুটো বন্ধ করতেই হবে, নইলে জাহাজ ডুবে যাবে! হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!

জাহাজের ডেকের ওপর হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। একজন জিজ্ঞেস করল—পাল নামিয়ে দেব? সারেঙ চিৎকার করে বললেন—না, না। কখনই এমন কাজ করো না।

এমন সময় দেখা গেল জাহাজের চলার বেগে দৈত্যের তলোয়ারখানা মটাৎ করে ভেঙে প্রায় সবটাই জাহাজের খোলের মধ্যে রয়ে গেল, দৈত্য ছিটকে পড়ল ঢেউ-এর মধ্যে।

অমিত জিজ্ঞেস করে—তারপর? দৈত্য বাড়ি চলে গেল?

বুড়োকত্তা—বাড়ি যাওয়া আর হল না। করাত মাছ কাছে কাছেই ছিল। সে দেখল তলোয়ার মাছের অস্ত্র ভেঙে গেছে, আর যুদ্ধ করতে পারবে না, অমনি ছুটে গিয়ে করাত দিয়ে তাকে দুই খণ্ড করে কেটে ফেলল। এই হল সাগরের জীবনসংগ্রাম।

চিতন বলে—কত্তামশাই, সাগরের ওপর মহলে এতক্ষণ আমরা দারুণ মারামারি কাটাকাটি দেখলাম। এবার চলুন জলের নীচে যাই। গভীর সাগরের তলায় কী আছে অমিত তা কোনদিন দেখেনি। সেখানে এক নতুন জগতের সঙ্গে ওর পরিচয় হবে।



পাতালপুরী



বুড়োকত্তার পিঠে বসে অমিত যখন সাগরের তলার দিকে নামছিল তার মনে হল, লিফ্‌টে বসে ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। নামা যেন থামে না। জল নীলাভ-সবুজ, শান্ত। আকাশ থেকে সূর্যকিরণ জলের মধ্যে দু'শ মিটার পর্যন্ত চলে যায়। নীলরঙ ক্রমে ফিকে হতে হতে কালো, আরো কালো, শেষে জমাট অন্ধকার হয়ে যায়। অমিত ভাবে—এ কোথায় এলাম? মাথার ওপর নীল আকাশ নেই, মেঘ নেই, বাতাস নেই, সাগরের ঢেউ নেই, এ যে অন্ধকার দৈত্যের পুরী; কে যেন ঘন কালি ঢেলে সব কালিময় করে রেখেছে।

এমন সময় দূরে সারি সারি ইলেকট্রিক বাল্‌বের শাদা আলো চোখে পড়ল। আলোগুলো কোন খুঁটিতে স্থির হয়ে নেই, চলে বেড়াচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। অমিত একবার অন্ধকার রাতে দূর থেকে আলোকিত ট্রেনকে ঝমঝম শব্দে চলে যেতে দেখেছিল। এখানকার আলোর সারি অন্ধকারে তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোন শব্দ নেই।

অমিত বুড়োকত্তাকে বলে—কত্তামশাই, এখানে দিনের আলো নেই বলে কি লোকেরা আলোর সারি নিয়ে পথিককে পথ দেখাতে আসে?

বুড়োকত্তা বলেন— এ শহর নয়, সাগরের পাতালপুরী। এখানে যারা আলো নিয়ে ঘুরছে তারা পথ দেখাতে আসেনি, এসেছে খাবারের খোঁজ করতে। ওদের গা থেকে যে ফসফরাস-আলো বের হচ্ছে তা দেখে ছোট মাছ ওদের কাছে আসে। তখন তাদের পথ দেখিয়ে আর বাড়িতে পোঁছে দেয় না, পাঠিয়ে দেয় নিজেদের পেটের মধ্যে।

অমিত বলে—তাহলে ওরা ডাকাত!

চিতন বলে—রাক্ষসও বলতে পার, শিকার ধরার ফন্দি ওই আলোগুলো। দেখ, কী বিদঘুটে চেহারা আর দাঁতগুলো কেমন ঝকঝকে ধারালো।

এমন সময় অমিতের চোখে পড়ল এক অদ্ভুত জানোয়ার। তার মাথার ওপর পদ্মের ডাঁটার মত এক নল, নলের মাথায় জোনাকির মত আলো। নীচের চোয়াল থেকে ঝুলে রয়েছে আমের মুকুলের মত একটি গুচ্ছ, তাতে আলোর কণা ঝিকমিক করে। অমিত ভাবে এমনি একটি আলো-দেওয়া প্রাণী বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাচের মাছঘরে রেখে দিলে ঘর আলো হয়ে থাকত, মা ভারি খুশি হতেন।

অমিত জিজ্ঞেস করে—আলো দিয়ে শিকার ধরে কেমন করে?

চিতন উত্তর দেয়—আলোর ফানুস নিয়ে আস্তে আস্তে চলে। ছোট প্রাণীরা ভাবে, বুঝি কোন খাবার, কোন রসাল শৈবাল। স্বাদ নেবার জন্য যেই কাছে আসে ওমনি তাকে মুখে ফেলে তারই স্বাদ নেয় ওই ধড়িবাজ ডাইনী। সাগরতলে চলার সময় সবাইকে সবদিকে লক্ষ রাখতে হয়।

কথা বলতে বলতে চিতন, বুড়োকত্তা ও অমিত সাগরের নীচে গিয়ে পোঁছল। পরিচ্ছন্ন জায়গা, কয়েকটি মাঝারি গোছের পাথরের গায়ে কয়েক রকম শেওলা গাছ। এক জায়গায় শাদা-কালো ছোট ছোট পাথরের নুড়ি বিছানো। বুড়োকত্তা পাথরের ওপর বসে বললেন—এখানে একটু বিশ্রাম করো।

হঠাৎ ছোট ছোট পাথরের টুকরো আপনা থেকেই নড়ে অন্যদিকে সরে গেল। পাথরনুড়ির নড়াচড়া দেখে অমিত বলে—একি! পাথরের টুকরোগুলোও ডাইনী নাকি?

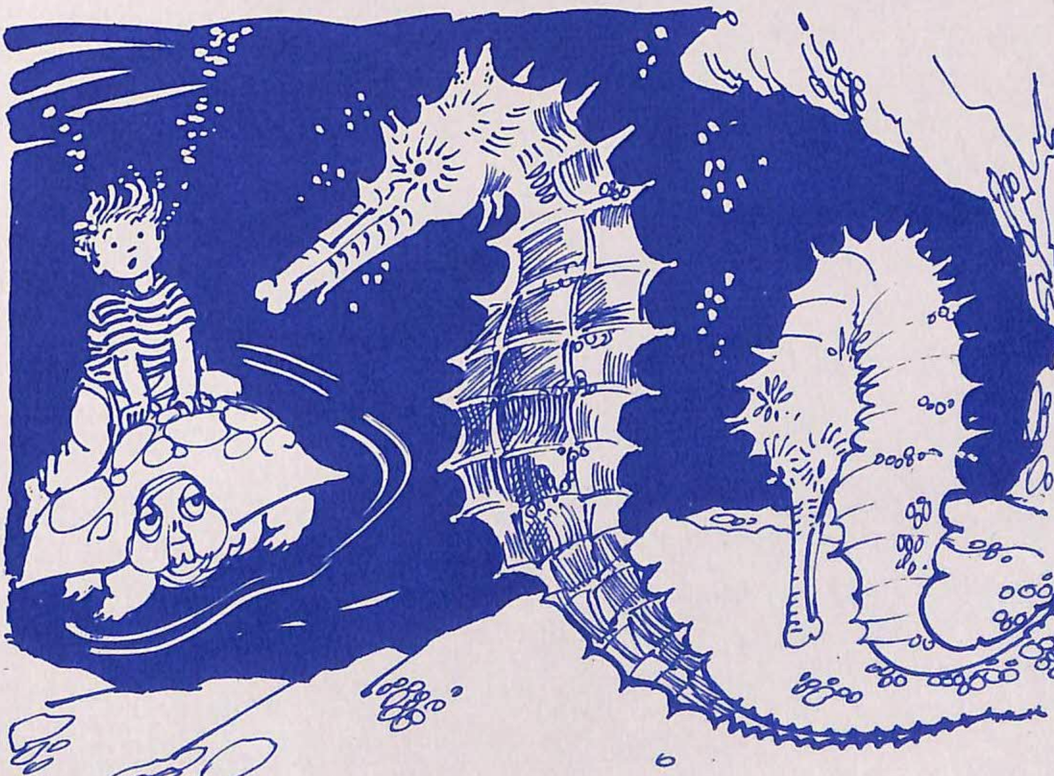
বুড়োকত্তা হেসে বলেন—অমিত দেখছি সাগরের প্রাণী চিনে ফেলেছে। ওটি ডাইনী নয়, বহুরূপী ফ্ল্যাটফিশ। বড় প্রাণী ধরার সাহস ওর নেই। কাজেই, কোন কোন মানুষ যেমন বহুরূপী সেজে অন্যকে খুশি করে বকশিস পায়, এই চতুর মাছটিও তেমনি। যখন যেখানে থাকে সেখানকার জমির সঙ্গে নিজের শরীর এমন কায়দায় মিশিয়ে দেয় যে সহজে কেউ বুঝতেই পারে না, ওখানে কেউ চুপটি করে রয়েছে। আরো মজা দেখ, ও সব সময় বাঁ কাতে শুয়ে থাকে, মাটি লেপটে। তাই বাঁ চোখটা উঠে এসেছে ডান দিকে। দু'টি চোখই ডান পাশে। এই তো এখানে পাথরের টুকরোর মধ্যে শুয়ে ছিল, গায়ের রঙ বানিয়েছিল

পাথরের টুকরোর মত। আমার চোখেই পড়েনি। এখন সরে গিয়ে যদি লাল-নীল-সবুজ-শাদা বালির মধ্যে শুয়ে পড়ে তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর গায়ের রঙকে বেমালুম ওই রকম করে ফেলবে। কাঁকড়া, চিংড়ি বা শামুকের বাচ্চারা হেঁটে হেঁটে খাবারের খোঁজে বেরিয়ে একবার ওর মুখের কাছে গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। টুপ করে ধরে সে তাদের পেটের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে, কেউ বুঝতেই পারবে না তারা কোথায় হারিয়ে গেল।

অমিত বলে—তাহলে বহুরূপী ফ্ল্যাটফিশ শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি বেঁচে থাকে?

বুড়োকত্তা বলেন—বহুরূপীর সাজ তার আত্মরক্ষা আর খাদ্যসংগ্রহ দু'টি কাজেই লাগে। বিপদ আসে যখন সে চলাফেরা করে। ওই সময় ফানুসমাছ, অক্টোপাস বা অন্য কোন বড় প্রাণীর নাগালের মধ্যে পড়লে সাজবদল করে বাঁচার সময় পায় না।

চিতন বলে—বুড়োকত্তা, ফ্ল্যাটফিশের শোয়ার কৌশল দেখা হল, এবার অমিতকে ঘোড়দৌড় দেখান।



অমিত ভাবে সাগরতলায় বুঝি ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা হবে। বলে—ঘোড়দৌড়ের জন্য তো সমতল জায়গা লাগবে, এখানে দেখছি পাথর, বালি, গাছ, শেওলা। দৌড় হবে কোথায়?

চিতন—সাগরের ওপর তলায়। সে এক অদ্ভুত জাতের ঘোড়া, গায়ে বর্ম, পেটে ক্যাঙারুর মত থলে। তাতে ডিমবাচ্চা নিয়ে চলাফেরা করে,লেজটি সব সময় পাকিয়ে রাখে আর চলে ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়ে।

অমিত বলে—কত্তামশাই, আপনি তো জানেন, সাগরে যে-ঘোড়া ছিল সেটি উঠেছিল সমুদ্র মন্থনের সময়। সেই ধবধবে শাদা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ইন্দ্র নিয়েছিলেন, পুরাণের গল্পে এই কথাই আছে, তাই না?

বুড়োকত্তা বলেন—হ্যাঁ, কিন্তু তার কথা আলাদা। কারণ সাগরে এখনো যারা রয়ে গেছে তারা উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর হলেও কেবল মুখটাই আছে তার মত, আর সবই পালটে গেছে। উচ্চৈঃশ্রবার গায়ে বর্ম ছিল না, এর সর্বাঙ্গ শক্ত বর্ম-খোলসে ঢাকা, মনে হবে মধ্যযুগের নাইটদের ঘোড়া বুঝি!

অমিত চিতনকে ফিসফিস করে বলে—একটা বাচ্চা ঘোড়া ধরে দিতে পার? সেই টাট্টুর পিঠে চড়ে যখন বেড়াব, লোকেরা তখন অবাক হয়ে দেখবে।

এর পর অমিতরা সাগরের ওপরে ভেসে উঠলে চিতন একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল—অমিত, ওই দেখ তোমাদের উচ্চৈঃশ্রবার বংশধররা লেজ দিয়ে একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে কেমন খাড়া হয়ে ভাসছে।

অমিত ভেবেছিল শ্বেতবর্ণের অশ্বশাবক দেখতে পাবে। তাই সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। পরে নজরে পড়ল আট-দশটা ঘোড়ামুখো মাছ একসঙ্গে লেজ জড়াজড়ি করে ভেসে রয়েছে। ওদের মধ্যে এমনই প্রীতি যে, সব সময় দল বেঁধে লেজ-ধরাধরি করে থাকতে ভালোবাসে। গায়ের রঙ শাদা নয়, কালচে খোলসে মুখ থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত মোড়া। যখন একাকী চলে ঘোড়ার মত ছোটে না, ছোট পাখনা দু'টি নেড়ে ধীরে ধীরে হাঁটার মত চলে। পুরুষ ঘোড়ার পেটের ওপর রয়েছে একটি থলি। তার থেকে কয়েকটি বাচ্চা ঘোড়া মুখ বের করে আছে দেখে অমিত ভারি খুশি হল।

বাবার কোলে বসে ওরা দেখছিল, অমিত বুড়োকত্তামশাই-এর পিঠে বসে ওদের দিকে চেয়ে হাসছে। ছোটরা ছোটদের ভালোবাসে।

বরুণরাজার বাগান



চিতন অমিতের আগে আগে চলছে। আনন্দে সে কখনো কখনো ডিগবাজি খায়। কখনো হাইজাম্প দিয়ে অমিতকে ডিঙিয়ে গিয়ে হাসতে থাকে, বলে—কেমন, আমার সঙ্গে লাফিয়ে পারবে?

অমিত বলে—লাফ দিয়ে আবার জলে পড়ছ কেন? মাথার ওপর থাকলে তো ছাতার কাজ হত।

চিতন বলে—তোমার ও-রকম ছাতা চাই? আচ্ছা, জাপানি ছাতা এনে দিচ্ছি। দেখ তো এই এটা, পছন্দ হয়?

অমিত চেয়ে দেখে, সত্যিই তো, বেগুনি রঙের সুন্দর একটি ছাতা জলে ভাসছে, দুই ফুট মত উঁচু। চিতন যখন ওটিকে উঁচু করে তুলল, দেখল, অর্কিডফুলের মত গুচ্ছ গুচ্ছ

মুকুল ঝুলছে, ছয়-সাত ফুট জুড়ে ছাতা ছড়ানো। হংকং-এর শখের বাজারেও এমন মনোহারী জিনিস অমিত দেখেনি।

অমিত জিজ্ঞেস করে—কত্তামশাই, ওটা সত্যিই কি ছাতা?

বুড়োকত্তা বলেন—সমুদ্রের চলমান উদ্ভিদ-প্রাণী, নাম হাইড্রয়েড, অবশ্য জাপানিরা ওর নাম দিয়েছে সাগরদেবী ওটোহিমে-র ছাতা।

অমিত বলে জাপানি ছবিতে মেয়েদের ওই রকম ঝালর দেওয়া ছাতা মাথায় বাগানের মধ্যে ঘুরতে দেখা যায়, যেমন রঙিন সুন্দর বাগান, তেমনি রঙিন ফুল।

চিতন বুড়োকত্তাকে বলে—অমিত হয়ত কাশ্মীরে মোগল গার্ডেন দেখেছে, মহীশূরে বৃন্দাবন গার্ডেন দেখেছে কিন্তু বরুণরাজার সাগর বাগান দেখেনি। চলুন ওকে নিয়ে প্রবাল উদ্যান দেখিয়ে আনি।

বুড়োকত্তা জিজ্ঞেস করেন—কোন উদ্যান? বারমুডা, না গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ?

চিতন বলে—বারমুডা অনেক দূরে, সেই আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরপূর্বে যে বিরাট বাগান সেইটাই বরং এখান থেকে কাছে। চলুন, ওখানে যাই।

বুড়োকত্তা রাজি হয়ে বলেন—তা বেশ! অনেকদিন আগে ভাইপোর নাতির বিয়েতে গিয়েছিলাম, আর দেখা হয়নি। চলো, দেখা যাক, নতুন কোন বাগান তৈরি হয়েছে কিনা।

চিতনরা অস্ট্রেলিয়ার দিকে চলতে শুরু করেছে, এমন সময় অমিত চিতনকে বলে—চিতন ভাই, ওই দেখ, একখানা নীল জাপানি ছাতা নৌকোর মত পাল তুলে চলেছে। ছাতাখানা আনো না, রোদের হাত থেকে বাঁচা যাবে।

চিতন নীলছাতার দিকে এগোতেই বুড়োকত্তা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, চিতন ওদিকে যেও না। হুলের জ্বালা মনে নেই?

চিতন জিজ্ঞেস করে—কেন, ওটা কী? ওর কি হুল আছে?

বুড়োকত্তা বলেন—চিনতে পারোনি? ওটা সেই 'পর্তুগীজ যুদ্ধজাহাজ' যার কাঁটা একবার তোমার গায়ে লেগেছিল!

চিতন ভালো করে দেখে বলে—সেটা তো গোলাপি ছিল, এটা নীল।

বুড়োকত্তা হেসে বলেন—এও এক বহুরূপী বলতে পার। শাদা, লাল, নীল, গোলাপি নানা রঙের পাল তুলে ওরা সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। ওই যে ফানুসের মত বেলুন দেখছ, ওর ভিতরে আছে গ্যাস। আর তার নীচের দিকে ঝুলে আছে বটের ঝুরি-শিকড়ের মতন লম্বা জাল। কখনো কখনো ওই ঝুরি ৩০/৩২ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে জলের মধ্যে ঝুলে থাকে।

অমিত জিজ্ঞেস করে—শিকড়গুলো কি মাটি পাওয়ার চেষ্টা করছে?

বুড়োকত্তা—না, ওগুলো 'পলিপ', এক ধরনের মিহি জীব, একত্রে জড়ো হয়ে সাগরে ভেসে খাদ্য সংগ্রহ করে। বেলুনে বাতাস লেগে ভেসে চলে, 'পলিপ'রা আরাম করে বসে বসেই মুখের কাছে খাবার পায়। নৌকো চালানোর জন্য ওদের কোন চেষ্টাই করতে হয় না।

ওদের রঙ দেখে ছোট ছোট প্রাণী কাছে যায় আর শিকড়জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। 'পলিপ'দের মুখে আছে বিষাক্ত রস। তা লাগলে ছোট প্রাণীরা অবশ হয়ে পড়ে, মানুষের গায়ে লাগলেও যন্ত্রণার শেষ থাকে না।

অমিত বলে—ওদের যুদ্ধজাহাজ বলে কেন? ওদের নাম হওয়া উচিত জালফেলা শিকারি।

বুড়োকত্তা—আগের দিনে সাগরে পালতোলা জাহাজ চলত। পর্তুগীজদের যুদ্ধজাহাজের মতই ওদের বেলুনের গড়ন। তাই থেকে মানুষই ওই নাম দিয়েছে।

অমিত চিতনকে জিজ্ঞেস করে—আমাদের দেশের খালে বিলে আমরা কচুরিপানার ফুল দেখতে পাই। এই পর্তুগীজ যুদ্ধজাহাজও কি তেমনি বরুণরাজার বাগানের ভাসমান ফুল?

চিতনের উত্তর—কচুরিপানা জলের উদ্ভিদ, সে প্রাণী ধরে খায় না। কিন্তু এই 'ম্যান-অব-ওয়ার' হল ক্ষুদে রাক্ষসের ভাসমান নৌকো। চল, বরুণরাজার বাগানে গিয়ে দেখবে অন্য রকমের দৃশ্য।

অনেকখানি পথ চলার পর দেখা গেল ওই দূরের দিগন্তে ঢেউগুলি বড়ই অশান্ত হয়ে শাদা ফেনা মাথায় নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আর পরের মুহূর্তে ভেঙে পড়ছে। ফলে জল সরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল জলের মধ্যে স্থির এক বিরাট মালা। এমন দৃশ্য



অমিত কোনদিন দেখেনি। বিস্মিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করে—কত্তামশাই, ওটা কী? সাগরের নেকলেস? সোনার ওপর রঙিন দামি পাথর বসিয়ে যে-মালা তৈরি হয় সেই রকম এর আকার দেখছি। আমি একবার এক বড় গহনার দোকানে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। দোকানদার একটা লালরঙের মস্ত চ্যাপটা বাক্স খুলতেই তার মধ্যে নীল ভেলভেটের ওপর সোনার নেকলেস ঝকমক করে উঠেছিল। ওই ঢেউগুলো সরে গেলে সাগরের বাক্সর ভিতর থেকেও যেন বিরাট এক নেকলেস বের হয়ে পড়ছে। ওটা কি সত্যিই নেকলেস?

বুড়োকত্তা হাসলেন, বললেন—বাঃ! অমিতের দেখার চোখ আছে। ওই যে দূরে, যেখানে ঢেউ-এর শূন্যপানে লাফিয়ে ওঠা আর লুটিয়ে পড়া দেখছ, ওটা গ্রেটব্যারিয়ার রীফ—প্রবালকীটের তৈরি পাথুরে দেওয়াল। দেখ, এখানে জল উষ্ণ, স্বচ্ছ, অগভীর। যেখানে ঢেউ-এর মাতামাতি সেখানে জলের মধ্যে অক্সিজেন বেশি পরিমাণে মিশতে পায়। আর জল অগভীর বলে জলের তলাকার পাথরের ওপর প্রবালকীটেরাও সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি করে।

অমিতরা যখন প্রবালপ্রাচীরের কাছে পৌঁছল চিতনের আনন্দ দেখে কে? ঢেউ-এর সঙ্গে তরতর করে শূন্যে উঠে কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে সে লাফিয়ে পড়ে। ওরা প্রবাল পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমে গভীর জলের দিকে নেমে গেল। নামার সময় দেখে, পাহাড়ের গায়ে নানা আকারের ফার্ণবনের মত সব প্রবালবাড়ি। স্বচ্ছ নীল-সবুজ জলে লাল, নীল মাছেরা দল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, ছুটির দিনে স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরা বাগানে বেড়াতে এসেছে। জলের তলায় এক হাজার ফুট পর্যন্ত প্রবালের বাগান। সবচাইতে সুন্দর ডিজাইনের প্রবাল দেখা গেল ১০০ থেকে ১৬০ ফুটের মধ্যে; যেমন রঙ তেমনি গড়ন।

অমিত জিজ্ঞেস করে—কত্তামশাই, প্রবাল উদ্যানে নানা ধরনের প্রবাল গাছ দেখছি—কোনটি হরিণের শিঙের মত,কোনটি ব্যাঙের ছাতার মত।কতক মানুষের মস্তিষ্কের মত বা প্রকাণ্ড গাঁদাফুলের মত, কতক আবার আকাশের তারার মতন। এই সব চমৎকার নকশা যারা করেছে সেই শিল্পীদের দেখা পাব না?

বুড়োকত্তা—প্রবাল উদ্যান যারা তৈরি করেছে তোমাদের ভাষায় তাদের বলা হয় 'কোরাল পলিপ' বা প্রবালকীট, আকারে এক ইঞ্চির ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ মাত্র কিন্তু একতা, ধৈর্য ও কর্মকুশলতায় তাদের মত শিল্পী কোথাও খুঁজে পাবে না। তারা দলবদ্ধ হয়ে এক এক গোষ্ঠী এক এক জায়গায় থাকে আর সব সময় বাড়ি তৈরিতে ব্যস্ত। তারা সাগরের বিশ্বকর্মা।

অমিতের প্রশ্ন—বাড়ি তৈরির জন্য মালমশলা কোথায় পায়?

বুড়োকত্তা বলেন—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। অন্যান্য প্রাণী মরে গেলে তাদের হাড়গোড় এদিক ওদিক পড়ে থাকে, নষ্ট হয়ে যায়, মানুষ তো মৃতদেহ পুড়িয়ে ছাই করে আর না হয় মাটির নীচে রেখে দেয়। 'কোরাল পলিপ'দের বাড়ি কিন্তু মানুষের দালান বাড়ির মত ইট

সুরকির নয়, তাদের নিজেদের দেহের অস্থি দিয়ে বানানো। এগুলো জমা হতে হতে ক্রমে সিমেন্টের মত শক্ত হয়ে যায়। একটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্যটি গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে আরেকটি। তোমরা কি তেমন পার?

অমিত—পলিপরা যে ভিন্ন ভিন্ন নকশা করেছে তা ওরা শিখল কোথায়?

বুড়োকত্তা উত্তর দেন—তোমরা মানুষরাই কেবল নানা বিষয় শেখ। অন্যান্য জীবের শিক্ষা থাকে নিজেদেরই ভিতরে, তারা যেন সর্ববিদ্যাবিশারদ, সবকিছু আয়ত্ত করেই রেখেছে। দেখনা, এক এক ঘরানার পলিপের বাড়ি তৈরিতে এক এক ঢং। তারকা পলিপরা যেমন কেবল তারকাই সৃষ্টি করে, তেমনি হরিণশিং যারা বানায় তাদের গোষ্ঠীর সবাই ওই একই ছাঁদে ইমারত গড়ে।



অমিত বলে—ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একই ধরনের প্রবালকুঞ্জ দেখলাম। তাহলে কি ওই শিল্পীরা ও-সব জায়গায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে?

বুড়োকত্তা—বলেছ ঠিকই। বাড়ি বড় হয়ে গেলে ঢেউ-এর ধাক্কায় বা অন্য কোন কারণে প্রবালকুঁড়ি ভেঙে জলের তোড়ে ছড়িয়ে যায়। আবার পলিপদের ডিম জলে ভেসে অন্য অঞ্চলে গিয়েও বসতি গড়ে তোলে। এরা সব বিস্ময়কর কর্মী।

অমিত বলে—শাজাহান বাদশা কত কত শিল্পী দিয়ে তাজমহল বানিয়েছিলেন। অমন সুন্দর ভবন আমি আর কোথাও দেখিনি। আমার মনে হয়, কোরাল পলিপদের ওপর ভার দিলে ওরা আরো সুন্দর ডিজাইনে তাজমহল বানাতে পারত।

বুড়োকত্তা অমিতের বুদ্ধির প্রশংসা করে বলেন—তা পারত বটে কিন্তু সে-তাজমহল সাগর জলেই রাখতে হত, আগ্রায় নেওয়া চলত না।

অমিত বলে—ও বুঝেছি। পলিপরা তো সাগর ছাড়া ডাঙায় বাঁচবে না। আচ্ছা, কতক প্রবাল দিয়ে অলংকার তৈরি হয়। সেগুলো কি প্রবালকীটদের জহুরিরা বানায়?

বুড়োকত্তা—প্রবালকীটেরা সবাই জহুরি। তবে গোলাপ পাপড়ির মত টুকটুকে লাল যে-প্রবাল অলংকারে বেশি ব্যবহার করা হয়, তা পাওয়া যায় ভূমধ্যসাগরে। ওই লাল প্রবালের খুব চাহিদা। আরও দুই ধরনের প্রবাল দুর্লভ এবং খুবই মূল্যবান। একটি হল উজ্জ্বল মসৃণ, কুচকুচে কালো। নাম হয়েছে রাজ প্রবাল বা 'কিং কোরাল', ভারত মহাসাগরে পাওয়া যায়। রাজ প্রবাল বলার কারণ, এটি রাজদণ্ড তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। অন্যটি জাপানের উপকূলে মেলে, মুক্তোর মত স্নিগ্ধ-সবুজ রঙ, নাম মুক্তো প্রবাল।

বুড়োকত্তা ও চিতনের সঙ্গে অমিত প্রবাল বাগানে গিয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেল। কী সুন্দর সুন্দর প্রবাল গাছ, মনে হয় কোন যাদুকর মন্ত্রবলে সব তৈরি করেছে। এতে নানা রঙের সমাবেশ। গোলাপি, বেগুনি, হলুদ, কমলা, মুক্তাশুভ্র—কত রঙের ছোট ছোট ঝোপঝাড়, প্রবালশিল্পীদের সব শিল্পকাজ। তার মধ্যে নানা উজ্জ্বল রঙের মাছেদের ভ্রমণ বিলাস। মেঝেতে কোমল-সবুজ রঙের শেওলার গালিচা। জলের তলায় এমন রঙিন চিত্রপুরী থাকতে পারে অমিত তা কোনদিন ভাবেনি।

অমিত বলে—কত্তামশাই, মনে হচ্ছে এখানে রাজার বাগানে গড়াগড়ি দিই, আর এখানেই, প্রবালপুরীতে, থেকে যাই।

চিতন বলে—অমিত, সাগররাজ্যের সামান্য কিছুমাত্র দেখেছ, আরো কত অদ্ভুত জিনিস দেখা বাকি। কত্তামশাই, এবার চলুন বরুণরাজার শান্তবনে যাই। প্রবাল উদ্যানের ওপারে, যেখানে সাগরটা প্রকাণ্ড একখানা গোল আয়না, রাজকন্যারা যেখানে সারাদিন বসে বসে নিজেদের মুখের ছায়া দেখে!



শান্তবন



প্রবাল প্রাচীর পার হয়েই অমিতরা এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এসে পৌঁছল। প্রাচীরের ওপারে সাগরজল একবার দূরে সরে যাচ্ছে, আবার ছুটে এসে ঢেউ হয়ে উঁচু লাফ দিচ্ছে। প্রতিবারেই শাদাফেনার পুষ্পার্ঘ ছড়িয়ে পড়ছে প্রবাল প্রাচীরের ওপর। কিন্তু এপারে স্বচ্ছ কাচগলানো স্থির জল। জল নয় তো যেন একখানা বিরাট দর্পণ, গোল রঙিন পাথরের ফ্রেমে বাঁধানো। জলে ঢেউ নেই, আকাশের ছায়া শান্ত নীল দর্পণের বুকে পড়ে, দূরে সারি সারি নারকেল গাছের ঘন সবুজ রেখা দেখা যায়। জলে সবুজ ছায়া ফেলে গাছেরা এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছে, কার কয়টি ফল ধরেছে, কোন গুচ্ছের ফল কতবড় হল।

অমিত জিজ্ঞেস করে—কত্তামশাই, এ কোথায় এলাম? সাগর তো মনে হয় না। ঢেউ নেই, জল গভীর নয়। জীবজন্তু,হাঙর-অক্টোপাসও কিছু দেখছি না।

বুড়োকত্তা বলেন—প্রবাল-প্রাচীরে-ঘেরা শান্ত জলাশয়, যাকে বলে উপহ্রদ বা 'লেগুন'। চিতন কবিত্ব করে বলেছে, এটি সাগরের আয়না। তা, কথাটা একবারে মিথ্যে নয়। অশান্ত উত্তাল সাগরের মাঝখানে এটি মরুভূমিতে মরুদ্যানের মত। আমি শুনেছি, হিমালয়ের উঁচু

অংশে নাকি এক হ্রদ আছে, নাম শেষনাগ হ্রদ, যেখানে জল দর্পণের মত মসৃণ, অপূর্ব সবুজ রঙ। তাতে ঢেউ নেই, কম্পন নেই, মাছ নেই, পাখি নেই। ওপরের বরফস্তরের নীচে থেকে জলধারা বেরিয়ে নদী হয়ে সমতলের দিকে চলেছে। হিমালয় নিথর পাষাণের রাজ্য। কিন্তু সাগর তো তা নয়। এখানে কলকোলাহলের মধ্যে, সাগরজলের মাতামাতির মধ্যে, শান্তজলের রাজ্য মনকে স্নিগ্ধ ও শান্ত করে।

অমিত বলে— জায়গাটা তপোবনের মত শান্ত। এখানে নিশ্চয়ই রাক্ষস-খোক্কস নেই। এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় হলে ভালোই হত।

বুড়োকত্তা বলেন—স্থির অগভীর জল, বালিপাথর, তটভূমিতে নারকেল গাছ—এই রকম জায়গাই কাঁকড়াদের প্রিয় বাসভূমি। তাদের মধ্যে মুনি কাঁকড়া আছে, যারা ভারতের মুনিঋষিদের মতন কুটিরে বাস করে। আবার চোর ডাকাতও আছে, যারা পরের জিনিস ছিনতাই করে খাওয়ার চেষ্টায় ঘুরছে। চলো, দেখা যাক, কাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়।

লেগুন পার হয়ে অমিতরা যখন তীরে উঠল দেখে যেন নার্সারি স্কুলের ছেলেমেয়েরা রঙিন ইউনিফরম পরে খেলার মাঠে ঘুরছে। ছোট ছোট অসংখ্য কাঁকড়া, লাল নীল সবুজ গোলাপি, কত রকম রঙ তাদের। কারো গায়ে রঙের নকশা। বাচ্চারা সবাই ভারি চটপটে। নতুন মানুষ দেখতে পেয়েই তারা ছুটে, মুহূর্তের মধ্যে, বালি আর পাথরের টুকরোর আড়ালে গিয়ে লুকোল। কৌতূহলী কেউ কেউ আড়াল থেকে দেশলাইকাঠির মাথায় গোল বারুদ বসানো পেরিস্কোপের মত চোখ বের করে দেখতে লাগল। অমিতের ইচ্ছা হল, ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে।

এমন সময় দেখা গেল একটি সবুজ শেওলাগুচ্ছ হেঁটে বেড়াচ্ছে। অমিত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—কত্তামশাই, এখানে কি শেওলা, গাছ—এরা সবাই চলাফেরা করে?

বুড়োকত্তা বলেন—ভাল করে দেখ, তবে বুঝতে পারবে। ইস্কুলে খেলার সময় তোমরা 'যেমন খুশি' সাজ করে যে রকম অন্যের চোখে ধুলো দিতে চাও, ওই কাঁকড়াটিও তেমনি শেওলার সাজ নিয়েছে। ও পিঠে তুলে নিয়েছে খানিকটা স্পঞ্জ, যাতে শত্রুর নজরে না পড়ে, আবার ফাঁকি দিয়ে খাবারও সংগ্রহ করা যায়। ওই দেখ, মুনিমশাই আসছেন।

অমিত কোথাও জটাধারী মুনি দেখতে পেল না। শুধু দেখে,একটি বড় শামুক, তার পিঠে খানিকটা স্পঞ্জ, খুব ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে। অবশ্য শামুকের মত মুখ বা দেহ নেই, কেবল খোলটাই যা শামুকের। কাছে গিয়ে দেখে, একটি কাঁকড়া শামুকের মধ্যে ঢুকে সেখানে নিজের বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে এবং সেটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

এই মুনিকাঁকড়াদের স্বভাব কিন্তু মোটেই শান্তশিষ্ট নয়। এদের শরীরের সামনের দিকটা শক্ত খোলসে ঢাকা কিন্তু পিছনের অংশ কোমল। আত্মরক্ষার জন্য তাই এমন কুটির চাই যা টেনে নিয়ে চলা যায়। যার মধ্যে নিরাপদে বিশ্রাম করা চলে। অন্য কোন মুনির সঙ্গে দেখা হলে ধর্মকথা হয় না, শুরু হয় কুটির দখলের লড়াই। একে অন্যকে খোলস থেকে টেনে

বের করে ফেলে ওই কুটিরটা অধিকার করতে চায়। যে জেতে সে সঙ্গে সঙ্গে শূন্য খোলসটার মধ্যে ঢুকে সেটি টানতে-টানতে নিয়ে চলে যায়। পরাজিত মুনি বিজয়ীর পরিত্যক্ত কুটির দখলে রাখে আপাতত। পরে সুযোগমত খালি শামুক বা শঙ্খ পেলে অধিকার করে। কখনো কখনো উপযুক্ত বাসা হতে পারে এমন কোন খোলসধারী দেখলে তাকে আক্রমণ করে মেরে খেয়ে তার খোলসটা নিজের করে নেয়।

অমিত দেখে, মুনিকাঁকড়াটি শামুক-কুটিরের মুখ থেকে দু'টি চোখ, চারখানা পা আর সামনে জাহাজের নোঙরের মত ভারি দাঁড়া বের করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। তার মনে হল,এ মুনি অহিংস নয়, রীতিমত যুদ্ধবাজ। বর্মপরা দেহসুদ্ধ তার চলার ভঙ্গি সৈনিকের যুদ্ধট্যাঙ্ক নিয়ে চলার মত। বনজঙ্গলে লড়াই করার সময় মানুষ-যোদ্ধারা তাদের পোষাকে গাছপালার নকশা এঁকে সবুজ রঙ করে নেয়, যুদ্ধের গাড়ি ডালপালায় ঢেকে রাখে যাতে সহজে শত্রুর নজরে না পড়ে। মুনিকাঁকড়ারা যুদ্ধে আত্মগোপন করার কৌশল হিসেবে নিজেদের কুটির-খোলসে স্পঞ্জ ও শেওলা লাগায়, গায়ের ওপর অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে।

মুনিকাঁকড়ার প্রশংসা করছে, এমন সময় চিতন অমিতকে ইশারা করে ডাকল। অমিত তার কাছে গেলে তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি নারকেল গাছের কাছে গিয়ে বলল—দেখ তো গাছে কে রয়েছে?



গাছের ওপর দিকে তাকিয়ে অমিত কতকগুলো কচি ও ডাঁসা নারকেল দেখতে পেল। বলল—বেশ নারকেল হয়েছে কিন্তু। দু'একটা পাড়তে পারলে খাওয়া চলত।

চিতন হেসে বলে—যিনি গাছে রয়েছেন তাঁকে বলো না, তোমার জন্য দু'টো নারকেল ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।

খানিক ভালো করে লক্ষ করে অমিত দেখল গাছে দু'টি বড় বড় কাঁকড়া নারকেল-থোকার ওপর বসে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কাঁকড়াকে গাছে দেখে সে অবাক হয়ে চিতনের দিকে তাকাল। এই সময় বুড়োকত্তাও গাছের কাছে এসে কাঁকড়াদের দেখতে পেলেন। বললেন—ও কাঁকড়া ভাইরা, শোন শোন। আমরা তোমাদের বাড়িতে অতিথি। আমাদের দু'একটা ফল পেড়ে দাও না।

একটা কাঁকড়া লম্বা দাঁড়া দিয়ে একটা নারকেলের বোঁটা কেটে নীচে ফেলে দিল। অন্যটি একটি নারকেল দাঁড়ায় ধরে গাছ থেকে নেমে এল, মানুষ যেমন নামার সময় মাথা ওপরের দিকে রেখে পিছিয়ে আসে, তেমনি করে।

চিতন বলল—নারকেল তো পেলাম, এখন ভাঙি কেমন করে?

যে-কাঁকড়াটি পায়ের দাঁড়ায় আটকিয়ে নারকেল এনেছিল সে সাঁড়াশির মত বড় ধারালো নখের ফলার মধ্যে সেটি নিয়ে চাপ দিয়ে দুই খণ্ড করে ফেলল। দেখা গেল দুই বাটি জল ও শাদা পুরু দু'টি রুটির মত নারকেলের শাঁস। এই গেছো কাঁকড়া চওড়ায় এক ফুট, গায়ে প্রচণ্ড জোর। নারকেল শাঁস তাদের প্রধান খাদ্য।

নারকেলের জল আর শাঁস খেয়ে অমিতরা কাঁকড়াদের ধন্যবাদ জানাল। তারপর অঞ্চল দেখতে যাত্রা করল। অমিত বলে—চিতন, প্রবাল বাগান দেখলাম কিন্তু মুক্তোফল তো চোখে পড়ল না?

চিতন হেসে জিজ্ঞেস করে—মুক্তোফল দেখতে কেমন জানো?

—কেন? আঙুরের মত থোকা থোকা ফলে।

চিতন হো হো করে হেসে বলল—সাগরের তলায় বুঝি তাহলে মুক্তোর বাগান আছে, যেখান থেকে পাকা পাকা ফল ঝুড়িতে করে তুলে আনা হয়?



মুক্তোবাগান



মুক্তো কোথায় পাওয়া যায়—চিতন ও অমিতের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনে বুড়োকত্তা মিটিমিটি হাসেন। পরে বললেন—অমিতের দোষ কী বলো? দাদুর বাড়িতে আঙুরগাছে থোকা থোকা আঙুর ফলতে ও দেখেছে, শুনেছে সাগরে মুক্তো ফলে, তাই ধারণা হয়েছে, আঙুরের মত মুক্তোরও লতানো গাছ আছে।

অমিত বলে—সত্যিই তাই। আমি ভেবেছি মুক্তোর বাগান থেকে একটা মুক্তো মায়ের জন্য নিয়ে যাব।

বুড়োকত্তা হেসে বলেন—তবে তো অমিতের ইচ্ছে পূরণ করতেই হয়। আচ্ছা, এবার আমরা মুক্তোবাগান দেখতে যাব। এখন, আগে, মুক্তোর গল্পটা শোন।

সাগর থেকে যত জিনিস পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচাইতে সুন্দর এবং মানুষের কাছে সবথেকে প্রিয় হল মুক্তো। অথচ মুক্তোর জন্ম কুৎসিৎ শুক্তির মধ্যে, যা কিনা সাগরতলে

গোপনে থাকতেই ভালোবাসে। শুক্তির মধ্যে মুক্তো সৃষ্টি করে সাগর কিন্তু মানুষকে একটি শিক্ষা দিচ্ছে।

চিতন জিজ্ঞেস করে—কী শিক্ষা?

বুড়োকত্তা চোখ মিটমিট করে হাসি হাসি মুখে বলেন—দেখতে যে অসুন্দর, তারও গুণ থাকতে পারে। আবার, অনেক চোখভোলানো সুন্দর নেহাৎই নির্গুণ। আমার দিকেই দেখো না, আকার কদাকার কিন্তু গুণ কিছু কম নেই। অন্তত, অধ্যবসায় দিয়ে খরগোসকে তো হারিয়েছিলাম।

চিতন হেসে বলে—আপনি কদাকার, একথা ঘোর শত্রুও বলতে পারবে না। আর আপনার গুণের তো তুলনাই নেই।

আত্মপ্রশংসা শুনে কেই-বা না খুশি হয়? বুড়োকত্তাও খুশিমনে আবার মুক্তোর গল্প বলতে লাগলেন।

—সেই অতি প্রাচীনকালে, একদিন এক জেলে অন্যান্য মাছের সঙ্গে কতকগুলি শামুক-ঝিনুকও তার জালে তুলেছিল। একটা শামুক খুলে সে পেয়ে গেল নিটোল সুন্দর একটা দানাফল। এমন সুন্দর জিনিস কী দিয়ে তৈরি হল? কেমন করে তৈরি হল? চাঁদের আলো আর কচি সূর্যের কিরণ মিশিয়ে এমন নয়নলোভন জিনিস শামুকের মধ্যে কে রেখে দিল? লোকের ধারণা হল, আকাশে যে-বিদ্যুৎ খেলে তার একটি কণা নিশ্চয় ছিটকে গিয়ে শুক্তির গায়ে লেগেছিল। তারপর তা-ই জমাট বেঁধে মুক্তো হয়েছে। কেউ বলল, শেষরাতে যে-শিশির আকাশ থেকে পড়ে, আকাশের কোমল নীলরঙ নিয়ে তা শুক্তির বুকের মধ্যে গিয়ে দানা বেঁধেছে। নইলে অমন রঙ আর নবনীত-আভা আসবে কোথা থেকে!

আসল কথা হল—শুক্তির খোলের মধ্যে কোন ছোট্ট শক্ত জিনিস, একটি বালির কণা বা অন্য কিছু ঢুকে গেলে শুক্তিটি অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কোমল গায়ের সঙ্গে তা সব সময় কাঁটার মত খচখচ করে। সেটাকে বের করে ফেলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাকে ঘিরেই সে একটা আবরণ সৃষ্টি করতে চায়। যাতে গায়ে খোঁচা না লাগে। ঝিনুক-শুক্তির খোলের ভিতরদিকে এক ধরনের উজ্জ্বল মসৃণ প্রলেপ থাকে। শুক্তি নিজের দেহের রস দিয়ে বাইরে-থেকে-আসা বস্তুটির ওপর পরের পর আস্তর লাগায়। ফলে, কিছুদিনের মধ্যে, বস্তুটি সেই উজ্জ্বল প্রলেপে ঢাকা পড়ে যায়। দ্রাক্ষালতায় আঙুর ধরে গুচ্ছ গুচ্ছ। মুক্তো কিন্তু এমন সহজে পাওয়ার নয়। হাজার হাজার শুক্তির মধ্যে একটিতে মুক্তো পেলেও ডুবুরিদের পরিশ্রম সার্থক।

অমিতের প্রশ্ন—ডুবুরি কী করে?

বুড়োকত্তা উত্তর দেন—চলো, নিজেই দেখতে পাবে। প্রাচীন যুগ থেকেই পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে জেলেরা ডুব দিয়ে মুক্তো তোলার কৌশল শিখেছিল। পরে

চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের কতক দ্বীপের চারপাশেও মুক্তো সংগ্রহের কাজ চলে। বসন্তকাল মুক্তো তোলার সবথেকে ভালো সময়।

চিতনরা গল্প শুনতে শুনতে যাচ্ছিল। খানিক পরে দূরে দেখা গেল একখানা ডিঙিনৌকো, তাতে একজন লোক দড়ি হাতে নিয়ে জলের দিকে ঝুঁকে কী যেন দেখছে। বুড়োকত্তা বলেন—চলো নীচে যাই, ডুবুরি নেমেছে। দম বন্ধ করে যতক্ষণ পারে ও থাকবে, ঝুড়িতে করে শুক্তি-ঝিনুক নিয়ে ভেসে উঠবে।

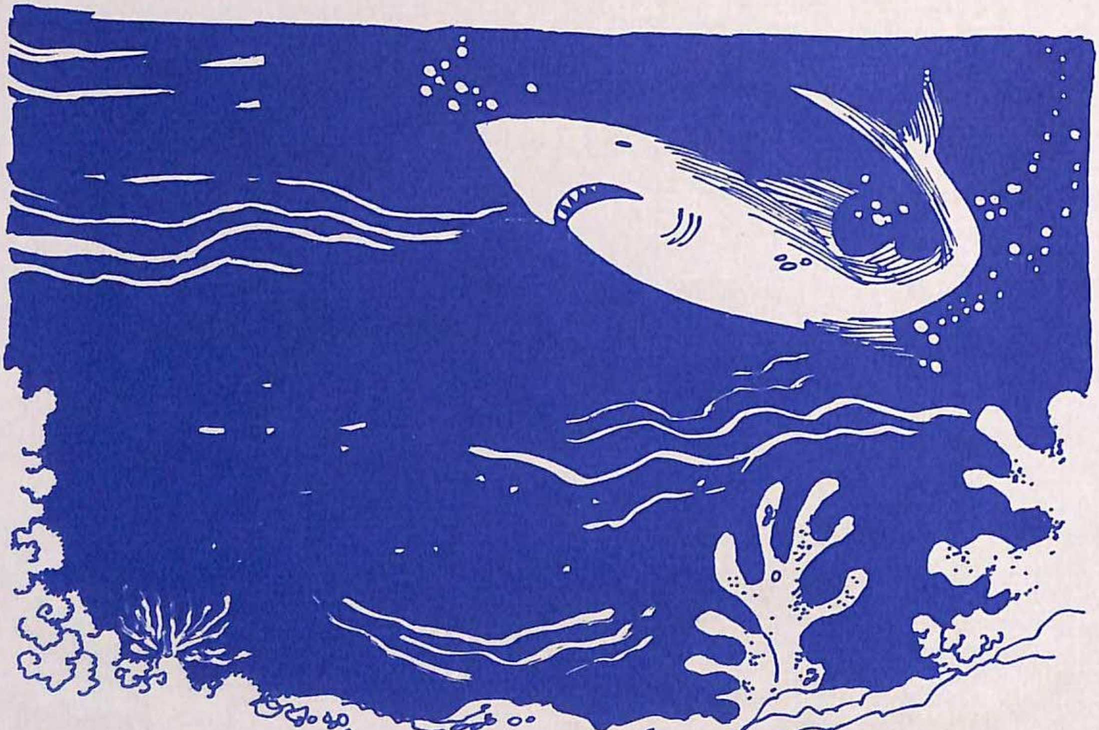
অমিতরা জলের তলায় নামতে নামতে মাটিতে গিয়ে পৌঁছল। জল ৪০ ফুটের বেশি গভীর নয়। ওপরের উজ্জ্বল আলো থেকে জলের নীচে গিয়ে অমিত প্রথমে ভালো করে কিছুই দেখতে পেল না। পরে চোখ সয়ে গেলে দেখল মেঝেতে, এখানে সেখানে, পাথরের টুকরো ছড়ানো। তার মাঝে মধ্যে রঙিন গাছপালা। প্রবালের কয়েকটা ঝোপগাছও চোখে পড়ে। হঠাৎ দেখে, কী যেন নড়ে উঠল। ভালো করে লক্ষ করে বুঝতে পারল—ওটি একটি লোক, নুড়িপাথরের মধ্যে হাত দিয়ে খুঁজে খুঁজে কী যেন তুলে পাশের ঝুড়িতে রাখছে। ওঃ এই তো ডুবুরি, শুক্তির সন্ধান করছে। খালি গা, জলের মধ্যে হঠাৎ মানুষ বলে চেনাই যায় না।



ডুবুরি তাড়াতাড়ি করে কয়েকটি বড় গোছের শুক্তি ঝুড়ির মধ্যে তুলল। অমিতের নজরে পড়ল, কে যেন সোজা জলের মধ্যে নামছে। এটি কী? কোন বড় মাছ? না, না। আরেকজন ডুবুরি ওই নৌকো থেকে সোজা নেমে আসছে।

দ্বিতীয় লোকটি কী করে তা দেখার জন্য অমিত ওর দিকে চেয়ে আছে, এমন সময় চিতন চেঁচিয়ে উঠল—অমিত, শীগগির এই ঝোপের আড়ালে এস, ওপরে তাকিয়ে দেখ, কে আসছে।

ঝোপের আড়ালে গিয়ে সামনের দিকে চাইতেই অমিতের চোখে পড়ল ঝকঝকে কয়েক সারি দাঁত। প্রকাণ্ড এক কুকুর যদি দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতে আসে তখন তার যে চেহারা হয়, তেমনি। একটা শাদা দানবের দু'খানা পাখনা আর চেরা লেজের দুই ভাগ নীলাভ জলের মধ্যে নিঃশব্দে মৃত্যুর মত এগিয়ে আসছে। হাঙর!



ডুবুরি এইবার হাঙরকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু ও মাটির সঙ্গে গা লেপটে স্থির হয়ে রইল। হাঙর বোধ হয় ডুবুরিকে রসাল খাদ্য বলে ঠাহর করতে পারেনি, ভেবেছে পাথর কিংবা ঝোপঝাড়। হাঙর এক পাশে সরে যেতেই ডুবুরি মাটিতে পা ঠেকিয়ে জোরে এক



ধাক্কা দিয়ে ধাঁ করে ওপরে উঠে গেল। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে পা লেগে ঝুড়ি থেকে কয়েকটা শুক্তি ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। দ্বিতীয় ডুবুরিটি একজনকে ঝটপট উঠে আসতে দেখে বিপদ হয়েছে মনে করে নিজেও ফিরে জলের ওপর ভেসে উঠল।

বুড়োকত্তা বললেন—মুক্তো তোলার বিপদ কী, দেখলে তো! হাঙর হল মানুষখেকো বাঘের মত, তবে মুখটা নীচে পেটের দিকে হওয়ায় চিৎ হয়ে কামড়াতে আসে। মুখ সামনে থাকলে ওর আক্রমণ ঠেকানো কঠিন হত।

ডুবুরির ঝুড়ি থেকে যে-শুক্তিগুলো পড়ে গিয়েছিল চিতন তা কুড়িয়ে এনে অমিতকে দিয়ে বলল—জানো অমিত, এই শুক্তিকে বলা হয় মুক্তা-জননী কারণ এরা মুক্তার জন্ম দেয়। খোল, দেখি, তোমার হাতে দু'একটা মুক্তো ওঠে কিনা।

বেশ!—বলে অমিত সুন্দর সুশ্রী দু'টো শুক্তি নিয়ে খুলল। দেখে, ভিতরে কেবল থলথলে মাংস, অন্য কিছুই নেই।

বুড়োকত্তা এতক্ষণ মিটিমিটি হাসছিলেন। শুক্তিগুলো উল্টে পাল্টে তার থেকে গায়ে ফুটো, শেওলাভরা কদাকার দেখতে একটা নিয়ে বললেন—দেখ তো এটা কেমন?

অমিত উত্তর দেয়—বিশ্রী, এবড়ো খেবড়ো, তাতে আবার কে যেন ওর পিঠে ফুটো করে দিয়েছে, ওটা ফেলে দিন।

—আচ্ছা খুলেই দেখ না, বলে অমিতের হাতে দিলেন।

অমিত শুক্তিটি খুলে বলে—এ কী! এটার মধ্যে যে ডিম হয়েছে! এই দেখুন—বলে একটি গোল পদার্থ বুড়োকত্তার সামনে সে তুলে ধরল।

বুড়োকত্তা বলেন—ভালো করে ঘষো, দেখ তো ডিমটা ভাঙতে পারো কিনা।

খানিক ঘষতেই ডিমটা চকচক করে উঠল, একটি নিটোল মুক্তো, আকারে বড় টিকটিকির ডিমের মত, রঙ কোমল, নীলাভ শাদা। দেখে অমিতের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল—বাঃ! কী সুন্দর রঙ। মুক্তো কি শুধু এই রঙেরই হয়?

বুড়োকত্তা উত্তর দেন—আরো কয়েক রঙের মুক্তো দেখা যায়, যেমন হলুদ, ঈষৎ হলুদ, শাদা, কালো।

—কালো?

—হ্যাঁ, কালো মুক্তোর আদর খুব, দামও অনেক বেশি। মুক্তোর মজা আছে। জন্ম শুক্তির পেটের মধ্যে অন্ধকারে কিন্তু অন্ধকারে বেশিদিন রাখলে এর আসল আকর্ষণ যে-ঝিলিমিলি আভা তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই মাঝে মাঝে সামান্য রোদের স্পর্শ দেওয়া ভালো। গরম জল মুক্তোর শোভা নষ্ট করে, আর কিছুটা নষ্ট হয় গায়ের ঘামে।

অমিত বলে—মুক্তো রাখতে তাহলে রীতিমত যত্ন নিতে হয়?

চিতন অমিতকে বলে—নিশ্চয়ই। যত্ন ছাড়া কোন ভালো জিনিস ভালো থাকে? কত্তামশাই মুক্তোটি তোমাকে দিয়েছেন, আর বলেও দিলেন কী করে যত্ন নিতে হবে। এটা যখনই দেখবে, সাগরে বেড়ানোর কথা মনে পড়বে।

অমিত আনন্দে বলে উঠল—ধন্যবাদ কত্তামশাই, এটি আমি মাকে দেব।

ভোর হয়ে গেছে। এই সময় মা ঘরে এসেছেন অমিতকে ডাকতে। 'এটি মাকে দেব' শুনে মা বলেন—কী দেবে অমিত?

অমিত বিছানায় উঠে বসল। ঘুম-ঘুম চোখ। কেমন যেন অবাক হয়ে, একটু সামলে নিয়ে বলে—একটা মুক্তো, কত্তামশাই—সেই ওল্ডবয়, তোমার জন্য উপহার দিয়েছেন।—বলে হাতের মুঠি খুলে মাকে দেখাল। সত্যি হাতে একটি কাচের মার্বেল রয়েছে, উজ্জ্বল শাদার মধ্যে নীল ছিটছিট।

মা মার্বেলটি হাতে নিয়ে পাশের ঘরে অমিতের বাবাকে ডেকে বলেন—দেখ, তুমি তো পারলে না, তোমার ছেলে আমার জন্য কেমন সুন্দর মুক্তো এনেছে। কে দিয়েছেন শুনেছ? সেই ওল্ডবয়, মিঃ টরটয়েজ, খরগোশকে যিনি দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছিলেন।

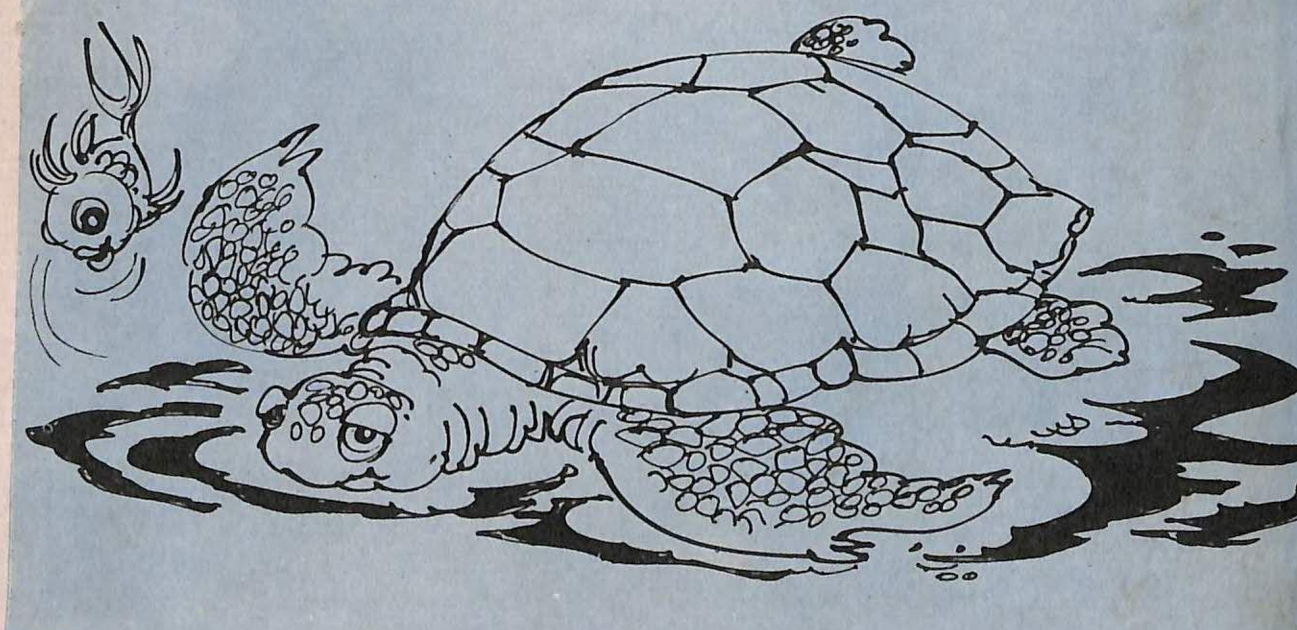
বাবা যখন খুব হাসছেন তখন অমিত বলে—মা, সাগরে কত অদ্ভুত সব জিনিস দেখলাম, চিতন আর কত্তামশাই-এর সঙ্গে। থাকলে তুমিও দেখতে পেতে।

মা অমিতের চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে বলেন—পরে তোমার সঙ্গে যাব। এখন, মুখ ধুয়ে খাবে চলো।



'বুড়ো কত্তা'র পিঠে চড়ে ডলফিনের সঙ্গে সাগর-ভ্রমণে বেরিয়েছে ছোট্ট অমিত। সে গিয়ে পড়েছে যেন এক রূপকথার রাজ্যে। যেখানে প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ, প্রতি পদক্ষেপে বিস্ময়। বিচিত্র সব ঘটনার ভিতর দিয়ে একটু একটু করে সে জানছে সাগর তলের রহস্য। ধীরে ধীরে তার পরিচয় হচ্ছে সমুদ্রের নানান বাসিন্দার সঙ্গে। তিমি, অক্টোপাস, হাঙর, স্কুইড, সেইল ফিশ, রিমোরা—এরকম কত প্রাণীকেই না সে চিনছে। জানছে, তাদের বিষয়ে যা কিছু জানবার।

এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে **দেশ** পত্রিকার মতামত: "..... **বইটির ছত্রে ছত্রে তথ্য, কিন্তু একবারও তথ্য-ভারাক্রান্ত বলে মনে হয় না। সমুদ্র সম্পর্কে এত কিছু জানার আছে। কিন্তু খুব কম বইতে এত সত্যভাবে এবং সুন্দরভাবে সমুদ্র উপস্থিত হয়।**"



নারায়ণচন্দ্র চন্দ (জন্ম : পাবনা, ১৯১৩), সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ। লেখকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কিশোর সাহিত্য-গ্রন্থ : অজানা দেশে মঙ্গোপার্ক, অজানার সন্ধানে কলম্বাস, জোয়ান অব আর্ক, গল্প বিতান, দেশ দেশান্তর, বনের বাসিন্দা, পাখির পরিচয়, হাজার পাখি হাজার বৈচিত্র, সমুদ্রের হাজার বিস্ময়, মাকড়সার চিড়িয়াখানা, মৌমাছির রূপকথা, গল্পে ইতিহাসের বীর।